Let´s stay
at home

মানব সভ্যতা আজ আবার এক ভয়ঙ্কর সমস্যার সম্মুখীন। মহাবিশ্বে উড্ডীন দুরন্ত মনুষ্যকুল এই মুহূর্তে স্ব-স্ব-গৃহে বন্দী। জাতি-বিদ্বেষ যা গর্বান্ধ মানবকুলকে হয়তোবা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে ঠেলছিল, আজ সাময়িকভাবে হলেও ক্ষান্ত। একতাবদ্ধ মানুষ এখন লড়ছে ধ্বংসাত্মক 'করোনা' ভাইরাসের বিরুদ্ধে। ভাবতে ভাল লাগে – সর্ব প্রকার বৈষম্যকে দূর করে, ব্যক্তিগত স্তর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত আজ সারা পৃথিবীর লোক একই উদ্দেশ্য সাধনে মগ্ন। বাংলা নববর্ষে আসুন আমরাও সেই প্রয়াসেই যোগদান করি...

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ১, সংখ্যা ১১
এপ্রিল ২০২০

নববর্ষ সংখ্যা

কলম হাতে

অরু ভট্ট, নাহার আলম, পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, রিয়া মিত্র, অমিতাভ রায়, ডাঃ অমিত চৌধুরী, শামসুদ্দিন শিশির এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

"আনন্দ আতঙ্ক মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া/মত্ত হাহারবে / ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর/ নৃত্য হোক তবে।/ ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্তে-আঘাতে/ উড়ে হোক ক্ষয়/ ধুলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের/ যত নিস্ফল সঞ্চয়।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নববর্ষের আগমনের সাথে সাথে সুস্থ-সুন্দর পৃথিবীকে আবার ফিরে পাওয়ার মঙ্গলময় কামনাই করি। দীর্ঘ কয়েক মাসের নিস্ফলতা পরিবর্তিত করে সফলতার আলো আনার সংকল্পে আমাদের আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতির চাপে সকল বিশ্ববাসী গৃহবন্দী। সকলের এই অবসর সময়ের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী হল গল্প ও কবিতা। 'গুঞ্জন' নববর্ষে নিয়ে এসেছে একসাথে দু'রকম উপহার। এক, 'গুঞ্জন' নববর্ষ সংখ্যা আর অন্য একটি বিশেষ উপহার।

তবে শুধু গল্প ও কবিতা পড়া আর পড়ানো নয়। তার সাথে চাই প্রত্যেক লেখা থেকে নিজের পছন্দের লেখাগুলিকে নিয়ে 'পত্রপ্রেরণ' করা গুঞ্জনের বিশেষ পাতায়। এই পত্র প্রেরণ পর্বের মধ্যে দিয়ে আপনিও বিকাশিত করুন আপনার সুপ্ত প্রতিভার। শুভ বাংলা নববর্ষের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবাই সুস্থ থাকুন ও ভালো থাকুন। ■

বিনীতা — রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

URL: https://www.boichoi.com/RohosyerCharOdhyay

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

প্রচ্ছদ চিত্রঃ গুঞ্জনের শিল্পী গোষ্ঠী

কলম হাতে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া মাসীমা, শ্রীমতি ডলি বিশ্বাস গত ২২শে মার্চ, অমৃতলোকে পদার্পণ করেছেন। পাণ্ডুলিপির সকল সদস্য-সদস্যাদের তরফ থেকে আমরা তাঁর অমর আত্মার পরম শান্তি কামনা করি।

জহুরী

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

এ ঘটনা এক গ্রামের, ঠিক গ্রামও নয় আধা মফস্বলের এক বিদ্যালয় থেকে তোলা একটি ছবি। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা নেহাত কম নয় প্রায় শ' পাঁচেক। স্কুলের বড়দি প্রতিদিনই স্কুলের ক্লাস শুরু হলে প্রতি ক্লাসের সামনে দিয়ে একবার একটি চক্কর দিয়ে আসেন। এটা নিয়ম মেনে তিনি দিনে দুবার করেন। এক প্রথম পিরিয়ড শুরু হয়ে গেলে আর টিফিনের পর পঞ্চম পিরিয়ড শুরু হলে। যেদিন তিনি এ স্কুলে প্রথম এসেছিলেন সেদিন থেকে এ রুটিনের কোন পরিবর্তন নেই।

নুতন বছরের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তাও প্রায় মাস চারেক হবে। পঞ্চম পিরিয়ড শুরু হলেই পঞ্চম শ্রেণীর খুবই শান্তশিষ্ট একটি মেয়ে পিছনের বেঞ্চে বসে নীরবে কেঁদে চলে। বড়দির তীক্ষ্ণ নজর এড়ায় না তা। একদিন স্কুলের গার্ডটিকে ডেকে বললেন, তোমাকে একটি দায়িত্ব দিচ্ছি তার ফলাফল আমাকে দুদিনের মধ্যে জানাবে। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় সে। বড়দি বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি পঞ্চম শ্রেণীর একটি ছাত্রী প্রতিদিন পঞ্চম পিরিয়ড শুরু হলেই পিছনের বেঞ্চে বসে নীরবে কাঁদে। গার্ডটি জানতে

চান মেয়েটির নাম, বড়দি নাম বলেন। নাম শুনেই গার্ডটির সপাঠ উত্তর, "ও! ওকে আমি চিনি। ওর বাপটা কিছু করে না। মা সারাদিনে এখান সেখানে থেকে কিছু জোগাড় করে আনে, দিনের শেষে তাই ফুটিয়ে বাচ্ছাগুলোর মুখে দেয়।" বড়দি নীরবে সব শুনে জানতে চান ছাত্রীটি কোথায় থাকে? গার্ড সব জানিয়ে বিদায় নেয়।

প্রতিদিনের মতো ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় বড়দির প্রাতঃভ্রমণ। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, তবে আজ যা হয়েছে তা হলো তার পথের দিক পরিবর্তন। হাঁটতে হাঁটতে দেখে আসেন সেই ছাত্রীর বাড়ি। একদিকে পাঠকাঠির দেওয়াল, তিনদিক খোলা, মাথায় খড়ের চাল। ঘরের এক কোণে কিছু পাতা কাঠ জোগাড় করা সামনে নীরব মাটির উনুন। ফিরে আসেন।

আজ বড়দি স্কুলে একটু আগেই এসেছেন। স্কুল গার্ডকে ডেকে জেনে নেন তার রান্না হয়ে গেছে কিনা? গার্ড কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, "না।" বড়দি তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলেন, "তুমি এক জনের বেশি রান্না করবে।" সে কিছুটা সংকোচ বোধ করলেও টাকা হাতে নিয়ে চলে যায়। চতুর্থ পিরিয়ড শেষ হওয়ার অনেক আগেই এসে সে বলে দুপুরের খাবার তৈরী। বড়দির গুরু গম্ভীর আদেশ, "আজ থেকে যতদিন না বলবো তুমি পঞ্চম শ্রেণীর ওই মেয়েটিকে

ডেকে খাওয়াবে, আর এ কথা যেন কেউ কোনদিন জানতে না পারে।”

মেয়েটির কান্না থেমে গেছে। বড়দি একদিন টিফিনের সময় গার্ডের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে লক্ষ্য করেন মেয়েটি তার খাবারের থেকে বেশ কিছুটা ভাত এবং তরকারি একটি পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে জামার তলায় লুকিয়ে রাখলো। তিনি কিছু না দেখার ভান করে তাঁর রুমে চলে এলেন।

স্কুল তার নিয়মে বসে গেল। বড়দিও তাঁর রুটিন টহল শেষ করে এসে গার্ডটিকে ডেকে বললেন, “আগামীকাল থেকে মেয়েটির খাবারের পরিমান দ্বিগুন করবে।” গার্ডটি কারণ কিছু বুঝতে না পেরে জানাল, মেয়েটিকে যা ভাত দেওয়া হয় তা সে খেতে পারে না, অর্ধেক তার বাড়ি নিয়ে যায়। বড়দি ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে আজ্ঞা পালন করতে বললেন। গার্ডটি বড়দিকে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি করে তেমনি এও জানে যে বড়দি প্রয়োজনে কোথায় কি করতে পারেন... এই রুটিন চলতে থাকে। দিন গড়ায়, মাস গড়ায়, বছরও গড়িয়ে চলে।

তারপর...

####

বাকিটা ইতিহাস। মেয়েটি আজ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এক বড় হাসপাতালের RMO (Resident Medical Officer)।

বড়দিদিটি সদ্য স্বর্গগতা আমার মা, শ্রীমতি ডলি বিশ্বাস। মায়ের জীবদ্দশায় কথা দিতে হয়েছিল – তাঁর কাজের কোন কথা যেন কোনদিন না লিখি। মজা করে বলেছিলাম, "তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে নিয়ে বই লিখবো।" হেসে বলেছিলেন, "লিখো তবে সে লেখা যেন কাউকে কোনদিন ছোট না করে বা তার মনে আঘাত না দেয়।" বই হয়তো কোনদিন লেখা হবে না! কিন্তু তাঁর জীবনের এমন বহু ঘটনা আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছে। তাই একটু একটু করে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র।

ইচ্ছাকৃত ভাবেই সেই মেয়েটির পরিচয় এবং স্কুলের নামটি গোপন রাখলাম। আজ তার স্বামীও একজন ডাক্তার।

আমাদের চলার পথে এমনি কত চারা অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। একটু স্পর্শ, একটু যত্ন পেলে তা হয়ে উঠতে পারে মহীরুহ... ■

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(১০)

প্রায় কুড়ি মিনিট সংগ্রাম করে পাড়ে এলাম। কিন্তু তার পরেই শুরু হল ৮ থেকে ১০ ফুট লম্বা ঘাসের জঙ্গল। আমার দুই সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলেছি। 'নর্মদে হর' বলে চিৎকার করতে থাকলাম। কোন উত্তর নেই। একটু ভয় করছিল, কি করবো বুঝতে পারছি না! আরও জোরে জোরে 'নর্মদে হর' বলে চিৎকার করে চলেছি।

কিছুক্ষণ পরে কাকাজীর গলা শুনলাম। শুনে সাহস পেলাম, জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চলেছি, দেখি একটা ফাঁকা জায়গায় ওরা বসে আছে।

আমি যেতেই ওরা উঠে পড়ল, একটু জল খেয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। এখানে নর খাদক নেই, কিন্তু খুব সাপ আছে। তাই বিশ্রাম নেওয়া গেল না, শুরু হল আবার পর্বত অভিযান।

প্রায় ৪৫ মিনিট কোন বিশ্রাম না নিয়ে উঠে চলেছি, কি কষ্ট যে হচ্ছে মা নর্মদা জানেন। একটা গুহা দেখলাম কিন্তু যাবার শক্তি নেই, আরোও উঁচুতে, এই ভাবে পিঠে ব্যাগ নিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এলাম বেলগাঁও, আর চলতে পারছি না,

পারার কথাও নয়। তাই আজকের মত একটি হনুমান মন্দিরে আসন পাতলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই বার্তা রটে গেল গ্রামে। না না মৈত্র মশাইএর সাগর সঙ্গমে যাবার বার্তা নয়, আমি ডাক্তার সেই বার্তা। গ্রামের অনেকেই আসতে শুরু করেছে পরামর্শ নিতে। কিন্তু এই অবস্থায় কি ডাক্তারি করা যায়, না সম্ভব? তবুও যেটুকু পারি চেষ্টা করে চা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। দিব্যানন্দজী পাশেই একজনের বাড়িতে খেতে গেলেন। কাকাজীও রাত্রে কিছু খেলেন না।

আজ ১০ই নভেম্বর, বাংলায় কালী পুজো, খুব সকালে হাঁটা শুরু করেছি। পাহাড়ি পথ, দশ কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেল সকাল থেকে, এককাপ চা পর্যন্ত পরেনি পেটে। একটা ভদ্রলোক পিছন থেকে ডেকে আমাদের থামতে বললেন, তিনি আমাদের ছ'টি পেয়ারা দিলেন, এতো ভাল খেতে লাগল তা বলার নয়।

ওনারই পরামর্শে আরও দু'কিলোমিটার হেঁটে গেলাম নর্মদা মন্দিরে। গ্রামটির নাম রামনগর। মন্দিরের পূজারী চা খাওয়ালেন। আমরা আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চললাম, তখন পেয়ারাটা খেয়ে ক্লান্তি কমে গেছে। দুপুর দুটোর সময় এলাম মধুপুরী গ্রামে। দিব্যানন্দজী তাঁর এক পরিচিত মাতাজীর বাড়িতে আনলেন। আজ এখানেই আসন পাতলাম। নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

মেবার ভ্রমণ

উদয়পুর পর্ব (১ম ভাগ)

মালা মুখার্জী

এতদিনে নিশ্চয় পাঠককুল বুঝে গেছেন যে আমার সব যাত্রাই কাকভোরে শুরু হয়, হ্যাঁ উদয়পুরে যাওয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। চেতক এক্সপ্রেসে টিকিট ছিল কাটা। ট্রেনটি ভোর ভোর চিতোরে এসে কুড়ি মিনিটের হল্ট দেয়, তবে মাঝরাত থেকেই *আই আর সি টি সি* জানাতে থাকে ট্রেন লেটের খবর। নাহ্, অত দেরি করলে চলবে না আমার। উদয়পুরে দু'রাতের বেশি বুকিং পাইনি, আমার ইচ্ছা ছিল তিন রাত থাকার। তাই আজকের দিনটাও কাজে লাগাতে হবে। অগত্যা উপায় সেই রোডওয়েজের বাস। চিতোর থেকে উদয়পুর যাওয়া খুব সহজ, অনেক ট্রান্সপোর্ট পাবেন, এমনকি ক্যাবও। সে তুলনায় আজমীর থেকে চিতোরের পথ শক্ত ছিল, বাসও কম।

হোটেল পান্নার কেয়ারটেকারই জানাল যে রোডওয়েজের বাস হোটেলের গেটেই থামে, তাই বাসস্টপে যাওয়ার দরকার নেই। তা একটি বাস থামলোও, সম্ভবত দিনের প্রথম বাস। এ বাসের টিকিট অগ্রিম অনলাইনে কাটা ছিল

না, কাটতে হলো। দুজনের ভাড়া একশ আশি টাকা। আড়াই ঘন্টায় উদয়পুরে পৌঁছে দিয়ে বাস যাবে আহমেদাবাদে। এতক্ষণ ধরে চিতোরের ইতিহাস শুনে এটা নিশ্চয় পাঠকরা বুঝেছেন যে গুজরাট আর চিতোর এবং উদয়পুর খুব কাছাকাছি প্রতিবেশী রাজ্য।

দুদিন ধরে ক্রমাগত ঘোরাঘুরিতে দু' চোখের পাতা এক হয়ে গিয়েছিল। যখন চোখ খুললাম, তখন পাহাড়ি পথ শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমরা উদয়পুরের কাছাকাছি এসে গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফতেহসাগর লেককে প্রদক্ষিণ করে বাস ঢুকে গেল বাসস্ট্যাণ্ডে, আমরা নেমে অটো নিলাম, হোটেল কাজরী আমাদের গন্তব্যস্থল।

উদয়পুর যে শীতের ছুটিতে কিরকম ভীড়ে ঠাসা থাকে তা নেমেই বুঝতে পারলাম। সারা শহরে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাসস্ট্যাণ্ড হতে অটো নিয়ে হোটেলে পৌঁছে ওয়েট করতে হলো, এক পরিবার রুম ছাড়লে তবে সাফ-সাফাই হবে ও ঘর পাব। অগত্যা হোটেলের বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট খেতে লাগলাম। কাজরী হোটেলটা একটু উঁচুতে, তাই ওপর থেকে দৃশ্যটা ভালোই লাগছিল। গাছপালায় ঘেরা শৈলশহর।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে না হতেই ম্যানেজার ঘর দিলেন, কারণ আগের বোর্ডার চিতোরের উদ্দেশ্যে ক্যাব নিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমরা খুশী মনে চেক-ইনের ফর্মালিটি করে স্নান সেরে যখন সাইট সিইঙ্গের জন্য ক্যাবের কথা বলতে

গেলাম তখনই ভুল বুঝতে পারলাম। এখানে সব গাড়িই ন'টা থেকে সাতটার শ্লটে বেরিয়ে যায়, এরপর ট্যুরিষ্ট সিজনে গাড়ি পাওয়া মুশকিল। আর উদয়পুরেই সবচেয়ে বেশি প্যাকেজ ট্যুর। প্রায় চার ধরণের প্যাকেজ ট্যুর আছে। প্রথমটা অবশ্যই সিটি ট্যুর, যাতে বোটিং, প্যালেস, দু-একটি মিউজিয়ম, সজ্জনগড়, মোতিমাগরি, মনসুন প্যালেস, সহেলীও কি বাড়ী এসব ইনক্লুডেড, আর আপনি যদি একান্তই ঘুরতে অপারগ হন তো শিল্পগ্রামের লোককলাকেন্দ্রে ঢুকিয়ে দেবে। ওখানে সারাদিন বসে নানা প্রদেশের নাচগান দেখুন।

দ্বিতীয় অপশনটি হোল চিতোরগড়, যেটা আমরা সেরে এসেছি। তৃতীয়টি হোল হলদিঘাটি, নিশ্চয় ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণকে হলদিঘাটির যুদ্ধের কথা বলে দিতে হবে না। এটি ছিল মহারাণা প্রতাপ ও সম্রাট আকবরের মধ্যে নির্ণায়ক যুদ্ধ। হলদিঘাটি আরাবল্লীর একটি গিরিবর্ত্ম মানে মাউন্টেন পাস। হলদিঘাটির সাথে সাথে একলিঙ্গ ও নাথদ্বারা ঘোরাবে। পাঠকগণের নিশ্চয় স্মরণে আছে, শিশোদিয়া রাজারা নিজেদের ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান বলতেন। চতুর্থ অপশনটি হল কুম্ভলগড় ও রণকপুর। এটি সবচেয়ে কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ।

আমি সিটি ট্যুরের জন্য কোনো গাড়ি তো পেলামই না, উপরন্তু একটি সিক্সসিটার ইনোভা সাড়ে তিন হাজারে

গছানোর চেষ্টা চলল আর কুম্ভলগড়ের প্ল্যান তো ম্যানেজার নস্যাৎই করে দিল মায়ের বয়সের দোহাই দিয়ে আর আমরা শুধু মহিলা বলে। বরাবরই হোটেল থেকে গাড়ি নিই, মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। অবশ্য আমিও দমবার পাত্রী নই। ওলা রেন্টাল বুক করে ফেললাম মাত্র সতেরশ টাকায় আট ঘন্টার জন্য।

গাড়ী পাঁচ দশ মিনিটেই এল ও ড্রাইভারটি বড় যত্ন নিয়ে শহর প্রদর্শন করাল। উদয়পুরে ফতে সাগর ছাড়াও লেক পিচোলা, স্বরূপসাগর, দুধতালাও নামে আরও অনেকগুলি লেক আছে। এটি একটি ওয়ালসিটি, বারম্বার মুঘল আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই ওয়াল সিটির পত্তন হয়, যার বিভিন্ন গেট বা দ্বার আছে, যেমন চাঁদপোল, উদয়পোল, হাতিপোল, সূরযপোল এইসব।

প্রথমেই নিয়ে গেল দুধতালাওয়ের ওপর মনসাপূর্ণা কার্ণিমাতা রোপওয়ে পয়েন্টে। আগেই বলেছি সারা শহরে থিকথিক করছে ভীড়, তাই বহু প্রতীক্ষার পর রোপওয়েতে জায়গা পেলাম। রোপওয়েতে উঠে, লেক আর প্রাসাদের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে, ওপরের পাহাড়ে গিয়ে কার্ণিমাতা দর্শন করে, এবং তারপরে রেষ্টুরেন্টে চা-কফি খেতে খেতে নীল লেকের ওপর শ্বেতশুভ্র প্রাসাদের শোভা দেখতে দেখতে আরও ঘন্টা খানেক ফিরতি রোপওয়ের অপেক্ষা করলাম।

চিত্র পরিচয়ঃ দুধতালাওয়ের ওপর কার্ণিমাতা রোপওয়ে হতে উদয়পুরের দৃশ্য...

এরপর আর ড্রাইভারকে অন্য কিছু ঘোরাতে না দিয়ে প্যালেসে পৌঁছে দিতে বলি। লেক পিচোলার তীরে উদয়পুর প্যালেস শুধু বড়ই নয়, দেখতেও প্রচুর সময় লাগে। এখানে দুরকমের টিকিট আছে, উইথ বোটিং ও উইদাউট বোটিং। অবশ্য বোটিংয়ের অন্য পয়েন্টও আছে। এখান থেকে বোটিং করে লেক প্যালেস যাওয়া যায়। সাধারণত সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা সিটি প্যালেস খোলা থাকে।

১৫৫৩ সালে রাণা উদয় সিংহের তৈরি এই প্রাসাদের নির্মানশৈলি এতই অপূর্ব যে হলিউডের মুভিরও এখানে শুটিং হয়েছে। বড়লোকেদের ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের অন্যতম

চিত্র পরিচয়ঃ হলদিঘাটির যুদ্ধ-উদয়পুর প্যালেস মিউজিয়ম...

জায়গা এই প্রাসাদ। এর ভিতরে বিভিন্ন দ্বার দিয়েই ঢোকা যায়, এর মধ্যে বাদিপোল মেইন এন্ট্রান্স।

অমর ভিলা, ভীমভিলা, বাদিমহল, জেনানামহল, চিত্রশালা, দরবার কক্ষ, শীষমহল, লক্ষ্মীচক এসব পয়েন্ট পরিদর্শন করলেও মোরচক বা পিকক স্কোয়ারের নির্মাণশৈলি আমায় মুগ্ধ করল। এ অংশটি পরে তৈরি, মহারাজা সজ্জন সিংহের আমলে। কালারফুল ময়ূরের মীনা করা ঝরোখা দেখে মন ভরে গেলে রয়েছে মিউজিয়াম। তাতে যেমন রাজাদের সোনারূপার ব্যবহৃত সামগ্রী আছে, তেমনি আছে পুরাতত্ত্ব। চিত্রশালার পেন্টিংগুলি অবশ্য দ্রষ্টব্য, এর মধ্যে হলদিঘাটির যুদ্ধের চিত্রটি উপরে দিলাম। এরপর বেরনোর পালা, বেরলাম আর এক গেট দিয়ে। নাঃ, এভাবে গাড়ি খুঁজে পাব কি করে?

... ক্রমশ ■

বীণাপাণি

সুভাষ মুখার্জী (নীলকন্ঠ)

॥৩॥ (অন্তিমাংশ)

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ:

সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করেন। ডান অংশ থেকে পুরুষ এবং বাম অংশ থেকে নারী সত্তার সৃষ্টি হয়। এই পুরুষ 'শ্রীকৃষ্ণ' এবং নারী সত্তার নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি কৃষ্ণের ইচ্ছায় নিজেকে– দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। প্রকৃতির সাথে কৃষ্ণের মিলনকালে প্রকৃতির নিশ্বাস ও ঘাম থেকে সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টি হয়। এই সঙ্গমের সূত্রে প্রকৃতি একটি ডিম প্রসব করেন এবং এই ডিমকে জলে নিক্ষেপ করেন। এতে কৃষ্ণ রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন – নিজ সন্তানকে ত্যাগ করেছ তাই কখনও সন্তান লাভের সুখ পাবে না, কিন্তু অনন্তযৌবনা হয়ে বিরাজ করবে। পরে দেবীর জিহ্বার অগ্রভাগ থেকে জন্ম নেন সরস্বতী, বাম অংশ থেকে লক্ষ্মী এবং ডান অংশ থেকে রাধার জন্ম হয়। সরস্বতী কৃষ্ণকে কামনা করলে তিনি তাঁকে নারায়ণের আরাধনা করতে বলেন। কৃষ্ণের সেই অভিশাপের কারণে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং রাধারও কোন সন্তান হয়নি। একবার

সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গঙ্গার মধ্যে বিবাদ হয়। এই সময় গঙ্গা সরস্বতীকে পৃথিবীর নদীতে পরিণত হওয়ার অভিশাপ দেন এবং ধরায় সরস্বতী নদীর উদ্ভব হয়। (প্রকৃতি খণ্ড)

মৎস্যপুরাণ:

প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে জপরত ব্রহ্মার দেহ ভেদ করে অর্ধেক স্ত্রী ও অর্ধেক নর রূপে একটি মূর্তি আবির্ভূত হয়। এরই স্ত্রীরূপ শতরূপা যিনি–গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী (ও ব্রাহ্মণী) নামে পরিচিতা হন। আবার কামদেবের শরে বিদ্ধ হয়ে ইনি সরস্বতীকে কামনা করেন এবং এই কন্যার সাথে মিলিত হয়ে প্রজা সৃষ্টি করেন। এই সূত্রে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা আবার স্ত্রী হিসাবে অভিহিত হন। (চতুর্থ অধ্যায়)।

বায়ুপুরাণ:

প্রথম কল্পান্তে পাপে পরিপূর্ণ সমস্ত জগৎ দেবাদিদেব রুদ্র কর্তৃক প্রবল তাণ্ডবে সংহৃত হয়। সেই সময় নতুন সৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাপিতা ব্রহ্মা তাঁর অন্তর থেকে সরস্বতীর জন্ম দেন নতুন জগতকে জ্ঞান, শিল্প ও সৌন্দর্যের আলোয় ভরিয়ে তোলার জন্য। সরস্বতীকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টি ও সূচনা।

সরস্বতী পুরাণ:

ঊর্বশীকে দেখে ব্রহ্মা কামাতুর হয়ে পড়লে তাঁর বীর্যস্খলন হয় যা মাটিতে পড়ে জন্ম হয় সরস্বতীর। (আর একটি সূত্রে পাওয়া যায় স্বমেহন করতেন ব্রহ্মা, নির্গত বীর্য

তিনি একটি পাত্রে জমা করে রাখতেন। একদিন ঊর্বশীকে দেখে অভ্যাস বশত হস্তমৈথুন করে তিনি সেই পাত্রে রাখেন আর তখনই উৎপত্তি হয় ঋষি অগস্ত্যের। পরে অগস্ত্য জন্ম দেন সরস্বতীকে।) ব্রহ্মা ও সরস্বতী পদ্মফুলে বাস করতে থাকেন বহু বছর এবং তাঁদের সন্তান স্বয়ম্ভু মনু ও কন্যা শতরূপার জন্ম হয়। পিতা ব্রহ্মা কন্যা শতরূপার প্রতি আকৃষ্ট হলে ক্ষিপ্ত হয়ে সরস্বতী তাঁকে পরিত্যাগ করেন এবং নদী রূপে পাতাল গমন করেন। যাবার আগে ব্রহ্মাকে অভিসম্পাত করে যান যে পৃথিবীতে কোথাও তিনি পূজিত হবেন না।

পদ্মপুরাণ:

সরস্বতী দক্ষরাজের কন্যা, কাশ্যপ মুনির পত্নী। ...সমাপ্ত ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।

আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com

২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।

৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।

৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।
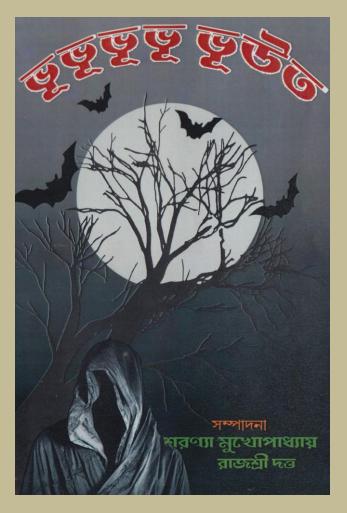
মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(১৩)

জয় কোন দিনই হাঁটেতে পারত না। কিন্তু কোন বিদেহী যদি কারোর দেহ ধারণ করে, তাহলে তার ইচ্ছাশক্তি অধিকতর শক্তিশালী হয়। তখন বিদেহীর অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করাই ঐ দেহের একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। এখন আমাদের একমাত্র কর্ম হল জয়ের কায়া থেকে নিশার অতৃপ্ত ছায়াকে মুক্তি দান করা।

দীনু, তোমার মনকে শক্ত করতে হবে। কারণ পরিবর্তনই জীবন। তোমরা চারজন এই চারটি চেয়ারে বসবে। অবচেতন জয়ের বাম হাতটা রঞ্জনা এবং ডান হাতটা দীনু ধরবে, আর দীনু ও রঞ্জনার হাত সুধীর ধরবে, কেউ কারোর হাত ছাড়বে না। আমি যজ্ঞ আসনে বসব।

কাল মাতৃপক্ষের শুভসূচনা। তার আগে এই যজ্ঞ সমাপ্ত করতে হবে। তবে একটা কথা মাথায় রাখবে, কেউ কারোর হাত ছাড়বে না সে যাই হোক না কেন। যদি কেউ হাত ছাড়ো, তাহলে হয়তো জয়কে আমরা চিরতরে হারাব।

যজ্ঞ শুরু হল। চারজনে হাত ধরে একসাথে চেয়ারে বসল। জয়ের হাতটা ছিল পুরো ঠাণ্ডা, যে ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া পূর্ব রাতে অনুভব করেছিল রঞ্জনা। ব্রজবাবু উচ্চনাদে

মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। কিছুটা সময়ের পর হঠাৎ টেবিলটা থরথর করে কেঁপে উঠল। ব্রজবাবু একটি একটি করে আঁকা ছবিগুলি যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেন। অজ্ঞান জয় সজ্ঞানে ফিরে এলো। সে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে দুটো হাত ছাড়াতে চাইছিল। সে বিকট জোরে শব্দ করতে লাগল, সেই শব্দটা এক গভীর করুণ আর্তনাদের মতো। ধীরে ধীরে জয়ের সমস্ত শরীর ঝলসে যাওয়ার ন্যায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। দরজার কোণের ফুলদানিটা বনবন করে চার-দেওয়ালে ঘুরপাক খেতে লাগল। ব্রজবাবু নিশার ছবিটা আহুতি দিতে গেলে, জয়ের কণ্ঠে নিশার কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে ওঠে – "শান্তি চাই, আর পুড়তে চাই না, কেন পোড়াচ্ছিস আমায়?"

ব্রজবাবু গম্ভীর গলায় বলে ওঠেন – "হে বিদেহী জয়ের শরীরে আশ্রয় নেওয়ার কারণ কি?"

নিশা ধরা গলায় বলে ওঠে — "প্রতিশোধ.... আমার নাম নিশা মিশ্র – আমার স্বপ্ন ছিল ব্যাডমিন্টন খেলার। বাবা আমার স্বপ্নপুরণের জন্য কলকাতায় ব্যাডমিন্টন শিখতে পাঠান। এ বছর ডিসট্রিক্ট খেলায় আমি চ্যাম্পিয়ান হই। সেই খেলা দেখতে এসেছিলেন বহু নামী-দামী লোক। তাঁদের মধ্যে ছিল মহেশ রায়। আমার ওপর মহেশ রায়ের কুদৃষ্টি ছিল। আমাকে ফোন করে নানাভাবে খারাপ প্রপোসাল দিত। যদিও সে সামনে কোনদিনও আসেনি, একদিন বেশ রাত হয়ে

গিয়েছিল, পায়ে হেঁটে হোস্টেলে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামে আমার সামনে। কটা লোক আমার চোখ-হাত বেঁধে গাড়ি করে নিয়ে যায় একটা লোকের বিছানায়। এরপর আমার ক্ষত-বিক্ষত দেহ একটা গাড়ির ডিকিতে ঢুকিয়ে দেয়। আমি তখন যন্ত্রণায় প্রায় অচেতন। তারপর এক ভয়ানক বিস্ফোরণ। আমি জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছিলাম। কি ভীষণ যন্ত্রণা। যখন বুঝলাম, তখন আমি নেই। আমার সামনে অজ্ঞান জয়ের দেহটা পড়েছিল, সেই থেকেই আমার ছায়া এই কায়ায় বাস শুরু করে। আর শুরু হল সেই দুষ্টের খোঁজ। কাল মহেশ যখন জয়ের কাছে আসে, আমি ওর গলা শুনে চিনতে পারি। কারণ আমি শুধু গলাই শুনেছিলাম। আমি মহেশকে শাস্তি দেবো। ছেড়ে দাও আমায়।”

— মহেশ এখন ওর শাস্তি ভোগ করছে, তোমাকে এখন ইহলোকের মায়া ছেড়ে অনন্তে বিলীন হতে হবে।

— না, এ দেহ আমার।

— তুমি অপর আত্মাকে পীড়িত করছ, যেটা অন্যায়।

জয়ের মুখের আড়ালে ভেসে ওঠে আরেক মুখাবয়ব, দীনুবাবুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে করুণা ভিক্ষা করে হাত ছাড়াতে চাইল, কিন্তু দীনুবাবুর মায়াহীন বাঁধন থেকে হাত ছাড়তে পারল না নিশা। এবার রঞ্জনার দিকে ক্রুদ্ধ-ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত ছাড়াতে চাইল। এবারেও ব্যর্থ হল সে।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

জয়ের চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু জল জমা হল। অন্যদিকে মন্ত্রের সাথে সাথে এক একটা করে ছবি আহুতি অনলে ভস্মীভূত হচ্ছিল। জয়ের শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে এল। শেষ রাতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, ঝড়ে ঘরের সব জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে তছনছ হয়ে গেল। যজ্ঞের আগুন প্রায় নিভে আসে। নিস্তেজ জয়ের শরীরের ওপর বিদেহীর শক্তির জোর হঠাৎ বেড়ে ওঠে, চারটি চেয়ারের বাঁধন আলগা হয়ে আসে। সবাই আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে যায়, মনে মনে শুধু এই ভাবে আর হয়তো জয়কে বাঁচানো যাবে না। ব্রজবাবু কোনক্রমে আগুন জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। তবুও জয়কে বাঁচানো আর নিশার অতৃপ্ত আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার শেষ প্রয়াস চারজনে মরিয়া হয়ে চালিয়ে যান। এক সাঁই সাঁই শব্দে জানলার সব কাঁচ ফেটে গেল। এক কৃত্রিম বাষ্পে ঘর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সকলের থেকে জয়কে সে যেন কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক ভয়ঙ্কর তাণ্ডব শুরু করে দেয় — এ যেন সৃষ্টি ধ্বংসের বীভৎস প্রলয় কাণ্ড...

হঠাৎ চেয়ারের চারটি সুতোর বাঁধন প্রায় ছিঁড়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে পুবদিক থেকে প্রথম ঊষার কিরণ জানলার ত্রিশূলে প্রতিফলিত হয়ে জয়ের কপালের মাঝে ঠিকরে পড়ে। একটা উদ্বায়ী বাস্প কুন্ডলাকারে জয়ের দেহ থেকে বেড়িয়ে সেই আলোর ছটার সাথে একাকার হয়ে মহা-শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। জয় চেতনা হারিয়ে টেবিলের ওপর

মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। বাইরে তখন শরতের সোনালি রোদের বর্ণময় আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আশপাশ থেকে ভেসে আসছে দেবীপক্ষের আরাধনা স্তব...

বেশ অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। জয়, সুধীরবাবু, ব্রজবাবু আর দীনুবাবু বারান্দায় সোফাতে বসে আছেন। জয় এখন অনেকটা সুস্থবোধ করছে, রঞ্জনা আর তার কাছে উপেক্ষিতা নয়, সে জানে তার অনিচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্যে রঞ্জনা কতটা কষ্ট পেয়েছে। সুধীরবাবুও এখন নিশ্চিন্ত জয় আর রঞ্জনার সম্পর্ক নিয়ে, তাই তিনি এখন বিবাগী হলেও আর পিছুটান নেই। দীনুবাবু অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন যে তাঁর নিখোঁজ মেয়েকে ঠিক খুঁজে বার করবেন, খোঁজ তো পেলেন অবশেষে, কিন্তু পরপারে... একরাশ কন্যা বিয়োগের বেদনা নিয়ে এবার দীনুবাবুকে বাড়ি ফিরতে হবে। ব্রজবাবুর কাজ শেষ, তিনিও একটু বাদেই গঙ্গা স্নানে যাবেন। রঞ্জনাও হারানো সংসার ফিরে পেয়ে এতদিনে স্বস্তি পেল। নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সুধীরবাবু, ব্রজবাবু আর দীনুবাবু যেই বাইরে বেরোতে যাবেন, রঞ্জনা পিছন থেকে তিনজনকে ডেকে জানাল — থানা থেকে এখনি ফোন এসেছিল; মহেশ রায় আজ ভোর চারটে নাগাদ আগুন ছাড়াই অদ্ভুতভাবে ঝলসে পুড়ে মারা গিয়েছে... ...সমাপ্ত■

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল' (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর 'পাণ্ডুলিপি' 'গ্রুপে'ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: মে সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ২০ শে এপ্রিল, ২০২০।

অন্য পৃথিবীর পদ্ম বাগান

স্বাগতা পাঠক

পর্ব - ২

হাসপাতালে ফোন করে শ্রাবন্তী এমার্জেন্সি ছুটি মঞ্জুর করিয়েছে। কাজে যাওয়া তো দূরের কথা সে এই দুই দিন ঠিক করে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত করতে পারছে না, আর ঘুম, সে তো যেন ওর চোখের রাস্তা ভুলেছে। দিন রাত নিজের ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে সে ইন্টারনেট ঘেঁটে চলেছে।

তার সাথে দুই দিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার কোনো মিল সে খুঁজে পাচ্ছে না। প্রতিদিন সে খুব নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা করছে ঐ ফুলগুলোকে। আজ প্রায় তিন দিন হোল সেই ফুলগুলো ওর ঘরে আছে, ওদের মধ্যে একটুও পরিবর্তন সে লক্ষ্য করছে না। ঠিক প্রথম দিনের মতই সতেজ, মনে হচ্ছে আরও যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে ফুলগুলো। শ্রাবন্তী এই নিয়ে গুনে গুনে ১৭৬ বার জল ঢেলেছে ফুলদানিতে। প্রতি ঘন্টায় ফুলদানি জল শূন্য হয়ে যাচ্ছে। সাধারণত কোনো ফুল এতো জল শোষণ করে না। একবার দু' বার তো ওর মনে হয়েছিল ফুলদানিটা ফাটা, কিন্তু না তা নয়, বার বার পরীক্ষা করে এখন সে নিশ্চিত।

কল্প বিজ্ঞান

ছুটি নেওয়ার পর শ্রাবন্তীকে নিলাদ্রী ছাড়া কেউ তেমন ফোন করেনি। নিলাদ্রী সেন, জুনিয়ার ডাক্তার গাইনোকলজিস্ট, দুই বছর হোল এই হাসপাতালে প্রাকটিস করছে। নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তীর মধ্যে সম্পর্কের কথা নার্সিং হোমের সকলেই জানে, এমন কি নিলাদ্রীর পরিবারেরও সবারই তা জানা। এখন বাকি শুধু শ্রাবন্তীর মা আর দাদা, বৌদিকে জানানো। বাবা মারা যাওয়ার পর শ্রাবন্তীর বড়দা-ই পরিবারের মাথা। নিলাদ্রীর মত সুপাত্রকে কখনই কোনো মেয়ের পরিবার প্রত্যাখ্যান করবে না। তবে শ্রাবন্তী এখনই বাড়িতে জানাতে চাইছে না, কারণ এখন জানালে মুশকিল। জানালেই বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপ দেবে। আর এক বছর সময় নিতে চায় সে। তাতে নিলাদ্রী বা তার পরিবারেরও কোনো আপত্তি নেই এবং এটা নিয়ে তাদের সম্পর্কেও কোনো টানাপোড়েন নেই।

কিন্তু সমস্যা হোল বিগত দুই দিনে শ্রাবন্তীর বদলে যাওয়া এই ব্যবহার। শুধু মাত্র স্নান খাওয়ার জন্য সে ঘরের বাইরে আসে, আর না হলে সারাদিন ঘর বন্দী। মা বা দাদা, বৌদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কেমন বিরক্তি নিয়ে উত্তর দেয়, আর বলে, “আমি কাজ করছি, বিরক্ত কোরো না।” ছোট ছোট ভাইপো ভাইজিদেরও সে এখন নিজের ঘরে আসতে দেয় না। এমনি কি গত পরশু থেকে সে নিলাদ্রীর ফোনটাও আর রিসিভ করছে না। মেসেজের পর মেসেজ

জমছে ইনবক্স জুড়ে কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই শ্রাবন্তীর, সে এখন ডুবে আছে এক অন্য জগতে।

আট দিনের মাথায় একদিন শ্রাবন্তী নিলাদ্রীকে ফোন করে দেখা করতে বলে, ময়দান চত্ত্বরে। নিলাদ্রী বার বার জোরাজুরি করছিল যাতে ওরা কোনো রেস্টুরেন্টে বসতে পারে কিছুক্ষণ, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে শ্রাবন্তী তাকে জানিয়ে দিল বেশি লোকজনের মাঝে সে কিছুতেই বসবে না। তার নিলাদ্রীর সাথে খুব দরকারী কথা আছে যেটা অন্য কেউ কোনো ভাবে টের পাক সে চায় না। আজ অনেক দিন পর ওর সাথে দেখা হচ্ছে, তাই কথা না বাড়িয়ে শ্রাবন্তীর কথায় রাজি হলো নিলাদ্রী।

বিকেল পাঁচটার মধ্যে নিলাদ্রী পৌঁছে গেল ময়দানে। এক বিশেষ জায়গায় গাছের তলায় পিকলু ওকে আসতে বলেছে। পিকলু শ্রাবন্তীর ডাক নাম। আদর করে নিলাদ্রী ওকে ঐ নামে ডাকে। পড়ন্ত বিকেলের আবির রাঙ্গা আলোতে খানিক দূর থেকে নিলাদ্রী শ্রাবন্তীকে দেখে থমকে গেল। মাত্র দশ দিনে একজন মানুষের এমন পরিবর্তন হতে পারে সেটা নিলাদ্রী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারত না, যদি না সে নিজে চোখে পিকলুকে দেখত। আনমনা ভাবে শ্রাবন্তী তাকিয়ে ছিল পশ্চিম আকাশের দিকে, আর নিলাদ্রীর সেই মুহুর্তে মনে হচ্ছিল স্বর্গ থেকে কোনো এক পরী নেমে এসেছে ওর সামনে। এমন নয় যে শ্রাবন্তী দেখতে সুন্দরী

না, কিন্তু মাত্র কয়েক দিন আগের মেয়েটির সাথে আজকের পিকলুর কোনো মিল নেই। এক রকম চোখ ধাঁধানো জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে ওর শরীর থেকে। চোখে মুখে এক অনন্য দীপ্তি| শরীরের অনাবৃত অংশগুলি থেকে যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে। চকচকে মসৃন। কাঁধ সমান চুল যেন হঠাৎ করেই এক হাত বেড়ে গেছে।

হলুদ রঙের শাড়িতে কোনো এক অপ্সরাকে দেখতে পাচ্ছে নিলাদ্রী চোখের সামনে। মন্ত্রমুগ্ধের মত কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল – খেয়াল নেই ওর। তারপর হঠাৎ ও লক্ষ্য করলো আশপাশের মানুষগুলোও যেন পিকলুর রূপের এই মাতাল করা ঝাঁঝালো নেশা স্নায়ু ভরে গিলছে। নিজেকে সামলে, ও এবার এগিয়ে গেল শ্রাবন্তীর দিকে। ওকে ডাকার পরই, যখন শ্রাবন্তী ঘুরে নিলাদ্রীর চোখের দিকে তাকালো, সে কিছুক্ষণের জন্য যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই চোখে যেন এক বিষাক্ত নেশা ডানা বেঁধেছে। সৃষ্টি, ধ্বংস, প্রেম, খিদে, ঘৃণা সব আছে ঐ চোখে... নিলাদ্রী কথা বলতে পারছিল না। শ্রাবন্তী ওর হাত ধরে সকলের চোখের আড়াল হয়ে একটা জায়গায় বসল। তারপর বলতে থাকল, “নিলাদ্রী তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে, এই কদিন কেন আমি নার্সিংহোম আসিনি, কেন কারো সাথে কোনো যোগাযোগ রাখিনি সব বলব তোমায় আজ। কিন্তু তুমি আমাকে কথা দাও যে তুমি

আমাকে বিশ্বাস করবে, আর আমি যা বলব এটা একান্ত গোপন থাকবে, আমাদের দুইজনের মাঝে।”

নিলাদ্রী তখনও ঘোর থেকে বেরোতে পারেনি। সে শ্রাবন্তীর সাথে মস্করা করতে গিয়ে বেগ পেল। না শ্রাবন্তী আজ ওর সাথে পাতি প্রেম আলাপ করতে আসেনি। এবার শ্রাবন্তী সমস্ত ঘটনা নিলাদ্রীকে খুলে বলল। অতি সতর্কভাবে এদিক সেদিক তাকিয়ে তার ব্যাগ থেকে সবুজ রঙের একটা পদ্ম ফুল বের করে, সে নিলাদ্রীর হাতে সেটা দিল। এতক্ষণ পিকলুকে দেখে নিলাদ্রী যতটা না অবাক হয়েছিল, এই গল্প শোনার পর সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। কিন্তু ওর এই গল্পের সত্যতা যাচাই নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলার আগেই, শ্রাবন্তী ওর হাতে প্রমান তুলে দিয়েছিল। ফুলটা হাতে নিয়ে নিলাদ্রী খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছিল এটা কোনো আর্টিফিশিয়াল ফুল নয়। আর অদ্ভুতভাবে পদ্মফুলের রং সবুজ, এটা নিলাদ্রীকে ভীষণভাবে অবাক করল।

এবার নিলাদ্রী বলল, “তবে এখন আমাদের কি করনীয়? মানে তুমি কি চাইছ?” শ্রাবন্তী এবার গলা নামিয়ে বলল, “আমি জানতে চাই, আমি কোন পৃথিবীতে আছি? আর এটা ছাড়াও এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে কটা পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে, কোথায় কোথায় প্রাণ আছে সবটাই আমি জানতে চাই। সময় যাত্রা, ব্ল্যাক হোল, ডায়মেনশন, কোয়ান্টাম ফিজিক্স, আমি বিজ্ঞানের সব জ্ঞান আহরণ করতে চাই। কল্পবিজ্ঞান

শুধুই কি কল্পনা, নাকি তাতে কিছু প্রমাণিত বিজ্ঞানও আছে!" অন্য সময় হলে ডাক্তার নিলাদ্রী সেন শ্রাবন্তীকে তার ডাক্তারি যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করে হাসিতে ফেটে পড়ত, কিন্তু এই মুহুর্তে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে সেটা কোনো ভাবেই সম্ভব হোল না। হাজার চাইলেও সে কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারলনা, কারণ ঐ চোখ দুটোর মধ্যে একটা গভীর সত্যি লুকিয়ে আছে। মনের ডাক্তারের মত সে মন না পড়তে পারলেও, একজন মানুষের আচরণ, তার তাকানো, কথা বলার ধরণ সব কিছু থেকে বিচার করা যায় সে মিথ্যে বলছে – না সত্যি। এখন এই মুহুর্তে নিলাদ্রীর ডাক্তারি মগজ আর প্রেমিক হৃদয় দুটোতেই একটাই উত্তর বিরাজমান – শ্রাবন্তী সত্যি বলছে।

ফুলটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকল নিলাদ্রী। তখনই পিকলু আবার বলে উঠল, "নিলাদ্রী সবার আগে আমাদের জানতে হবে, এই ফুলটির বিশেষত্ব, এটা কোন্ ধরণের পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, জল ছাড়া আর কি কি উপাদান এর বেঁচে থাকার রসদ, এবং গোড়া থেকে উপড়ে ফেলার আজ ১০ দিন বাদেও এত সতেজ থাকার রহস্য কি? প্রতি ঘন্টাতে কত পরিমাণ জল এটা শোষণ করে?" নিলাদ্রী এবার কিছু বলতে যাওয়ার আগেই, শ্রাবন্তী আবার বলল, "এর জন্য তোমাকে আমার পাশে থাকতে হবে।" নিলাদ্রীর কপালে ভাঁজ পড়ল। শ্রাবন্তী তাও বলে চলল,

"এই সময় একজনই আমাদের হেল্প করতে পারে, সে হোল রাজর্ষি দা।" নিলাদ্রী অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "রাজা?" হঠাৎ ওর মুখে হাসি খেলে গেল, "ঠিক, পিকলু ঠিক বলেছ একমাত্র রাজাই পারবে আমাদের হেল্প করতে। আর ব্যাপারটা গোপনও থাকবে। সাথে সাথে পকেট থেকে ফোন বের করতে যাচ্ছিল নিলাদ্রী। পিকলু ওকে বাঁধা দিয়ে বলল, "না এইখানে না, বাড়ি যাও তারপর শান্ত মাথায় রাজর্ষি দা কে ফোন করো, এটা পাবলিক প্লেস।"

রাজার সাথে নিলাদ্রীর কথা হয়েছে, ফোনে যতটা বোঝানো সম্ভব, সে রাজাকে বুঝিয়েছে। রাজর্ষি ব্যানার্জী, মেডিক্যাল কেমিস্ট্রিতে পি.এইচ.ডি. হোল্ডার। এখন ব্যাঙ্গালোরের একটি নামী ফার্মাস্যুটিক্যাল কোম্পানিতে বিশেষ কিছু রাসায়নিক নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত, নতুন ওষুধের ফর্মুলা তৈরীতে। নিলাদ্রী আর রাজর্ষি সেই স্কুল থেকে 'বন্ধু কম ভাই বেশি', সম্পর্ক বহন করে চলেছে। দুইজনের পারিবারিক দিক থেকেও একটা ভালো যোগাযোগ আছে।

গল্পের সবটা না বুঝলেও, রাজর্ষি এটা বুঝেছে যে – কোনো ভাবে একটা অদ্ভুত গোছের ফুল নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তীর কাছে পৌছেছে, যেটার কিছু বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং সেটা মোটেই স্বাভাবিক না। তাই এখন একটা গুরু ভার রাজর্ষির উপর এসেছে, এই ফুলটাকে নিয়ে একটু গবেষণা করে সঠিক তথ্য ওদের দেওয়া।

নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ততার মাঝে সে সময় করে উঠতে পারছে না। কিন্তু বন্ধুর অনুরোধও ফেলা যায় না। নিলাদ্রী আগেও বেশ কয়েকবার বোকা বোকা কাজ কর্ম করে রাজাকে বিরক্তির শেষ সীমায় পৌছে দিয়েছে। তাই রাজা ওর কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিত না। কিন্তু এবার রিকুয়েস্টটা এসেছে বন্ধুর প্রেমিকার তরফ থেকে, তাই সে আর না করতে পারল না।

কিন্তু তার পক্ষে এই মুহুর্তে কোনোভাবেই কলকাতা ফেরা সম্ভব না। তাই সে স্পষ্ট জানিয়েছে, হয় তাদের বড়দিন অবধি অপেক্ষা করতে হবে, সে ছুটিতে ফিরে বিষয়টা নিয়ে গবেষণায় বসবে। আর না হলে, যদি সম্ভব হয়, ফুলটি পার্সেল করে পাঠিয়ে দিতে। ইমার্জেন্সির নিয়মে পাঠালে সেটা ২৪ ঘন্টাতে পৌছে যাবে ওর হাতে। শ্রাবন্তীর সাথে আলোচনা করে নিলাদ্রী সিদ্ধান্ত নিল, সে ফুলটি কালই কুরিয়ার করবে, এমের্জেন্সী বেসিসে।

কুরিয়ার হাতে পেয়েই রাজর্ষি জানিয়ে দিয়েছিল নিলাদ্রীকে। কিন্তু আজ প্রায় চার দিন হলো কোনো খবর পাচ্ছে না নিলাদ্রী। ফোনের পর ফোন করেই যাচ্ছে, কিন্ত কোনো রেসপন্স আসছে না অপর দিক থেকে। মাঝে মাঝে কাজের মাঝে মগ্ন থাকলে রাজা দা ফোন ধরে না। “তবে কি ঐ পার্সেলটা নিয়ে ঘরে ফেলে রেখেছে? সময় পায়নি ওটা দেখার!” এই সব ভেবে শ্রাবন্তীর বড্ড রাগ হোল।

প্রতিদিন এই নিয়ে নিলাদ্রীর সাথে মনমালিন্য চলতে থাকল। নিলাদ্রীও নিরুপায় হয়ে বার বার রাজর্ষিকে ফোন করে নিরাশ হতে থাকল।

তারিখটা ছিল একুশে ডিসেম্বর, রাত তখন প্রায় ৩ টে বেজে ৫০ মিনিট, সারা রাত শ্রাবন্তীর সাথে ঝগড়া করে সবে ফোনটা কেটেছিল নিলাদ্রী। একটু তন্দ্রা ভাব ঘিরে ধরেছিল তাকে। এর মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠল। ফোনের স্ক্রিনে রাজার নামটা দেখে তরাক করে উঠে বসে ফোনটা রিসিভ করলো নিলাদ্রী। ও কিছু বলার আগেই ঐ প্রান্ত থেকে একটা চাপা উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে এলো, "নিলাদ্রী আমি কাল কোলকাতা ফিরছি, কাউকে জানাস না, আমি বাড়ি যাব না, আমার জন্য একটা হোটেলে রুম বুক করবি, বে-নামে, তুই আর পিকলু আমার সাথে কাল বিকেলে ঠিক পাঁচটায় দেখা করবি, আমার ঠিকানা যেন অন্য কেউ না জানতে পারে। আজ রাতেই হোটেল বুক কর, আমাকে হোটেলের নাম সহ সব ডিটেলস হোয়াটস অ্যাপে সেন্ড কর। আমি ভোর ৫.২০ এর ফ্ল্যাইটে এইখান থেকে রওনা দেব। তার আগেই আমার ফোনে হোটেলের ডিটেলস টা যেন চলে আসে। কারণ ভোর ৫.২০ এর পর আমার এই ফোন নাম্বর চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে।" এক বারে কথাগুলো বলে গেল রাজর্ষি। নিলাদ্রীর মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হচ্ছিল না, সে অনেক কষ্টে শুধু বলতে পেরেছিল

"কিন্তু"। তারপর আবার রাজর্ষির কণ্ঠ "আর কোনো কথার সময় নেই বন্ধু, তোরা নিজেরাও জানিস না তোরা কি জিনিসের সন্ধান পেয়েছিস? এই ফুল, এই পৃথিবীর নয়, কোনো ভাবেই হতে পারে না। এ কোনো এক 'অন্য পৃথিবীর পদ্ম বাগান' থেকে আনা।"

অনেক চেষ্টার পর একটা হোটেল বুক করে সমস্ত ডিটেলস রাজাকে পাঠিয়ে, ঘড়ির দিকে দেখল নিলাদ্রী, ভোর ৪ টে বেজে ৪৫ মিনিট। এখনই পিকলুকে একটা ফোন করা দরকার।

পিকলুর ফোনের কলার টিউনে বেজে চলেছে, নিলাদ্রীর প্রিয় গান "আসমা... সে পারে... এক যাঁহা হ্যায়... কহিঁ... ঝুট সাচ কা বঁহা কায়দা হি নেহি... রোশনি মে... বঁহা কি আলগ নূর হ্যায় ... চল বঁহা যাতে হ্যাঁয়, চল বহা যাতে হ্যাঁয়..." ■

শুনুন শিল্পীর কণ্ঠে আরও কিছু সুন্দর গান

https://www.youtube.com/watch?v=mp0Ig1UCHbk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=Ost25lIB7rQ

https://www.youtube.com/watch?v=H_Oi5hUbCj0

শুভ নববর্ষ
১৪২৭
শুভ নববর্ষ
শুভ নববর্ষ
১৪২৭
শুভ নববর্ষ
শুভ নববর্ষ
১৪২৭
শুভ নববর্ষ
১৪২৭

মনের কোণে

শবরীর প্রতীক্ষা

অরু ভট্ট

জাফরানি রোদ্দুর
ভ্রুকুটিতে ছিল।
উল্লেখহীন শর্তে
আসার সবুজ ইঙ্গিত।

সাহারার শীতল জল
হিমালয়ের উষ্ণ তুষার
মধ্যাহ্নের সূর্যের উষ্ণ কিরণে
উপহারের অঙ্গীকার.
তবু অধরা অধর।

বসন্তের শেষে সঞ্চয়
বিন্দু হতে ক্ষীণ,
নিঃস্ব হেমন্তের
রিক্ত হৃদয় পর্ণমোচী
এবার কি তুমি আসবে? ■

কি চাও তুমি বলো?

নাহার আলম

কি চাও তুমি বলো?
কেনো বারে বারে এক কথা বলে মন করো
এলোমেলো?
আমি তো দেখেছি জারুল পারুলের ফুল, মেলেনি এখনও দল
দেখেছি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষীণতোয়া নদীর বুক,
ভরালো কেমন পাহাড়ি ঝরনার জল; উছল! উছল!
ফুল চাই? না, জল চাই তোমার? সত্যি করে বলো
কিছুই যদি না চাও তবে, ওই দূর মাঠে যাবে চলো
যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে মাটি গাছ নদী জল পাহাড়
যেখানে আলো আঁধারের সাথে মাতে সঙ্গমে – আহা! কী
অপার!

নোনা বরষার মরসুমে দেবো অঢেল ভরসা আমি
মিথ্যে নয় গো, সত্যি বলছি – জানে অন্তর্যামী।
জুঁইকুঁড়ি নয় এনেছি কুড়ায়ে আমকুঁড়ি শত শত, তারে দেবো
বলে আজ
ইস্! কী জানি কেনো যে এমন করে বারে বারে পায় এতো
এতো লাজ?

অনুভব

গোপনস্নানে আজ অভিসারী গোধূলি দেখো সেজেছে কেমন
বিমুগ্ধ বিধূরতায়;
সে ও কি তবে আমারই মতোন আছে ঠায় দাঁড়িয়ে তার
প্রিয়ার অপেক্ষায়?
বিমনা মাছরাঙা আর পাপিয়ারও তো দূরে ওই থেমে থেমে
কেমন বিধূর বিধূর ডাক শোনা যায়।

এ কি! ওই দূর থেকে এ কিসের কলরব শোনা যায়?
উদাসী বাতাসে কেমন খরিফের আভরণ-ছোঁয়া তিলফুলের ম
ম গন্ধ পাওয়া যায়!

ইস্! কী দারুণ!
ও গো, শুনছো? এসো না কাছে, দেখবে চলো...
ওই দূরে স্বভারে উঠেছে ফুটে কেমন পারুল পলাশ পিপুল
বসাক নাগলিঙ্গম আর দক্ষিণীবাবুল
আরও কত শত আম্রমুকুল!

অরণ্যরাও কেমন সেজেছে পাখি-ফুলে আজ!
বিমুগ্ধ নিঝুম – যেনো তাপছোঁয়া ভুল!

নীলকণ্ঠ পাপিয়া ফুটফুটি বাবুই
মাতে সঙ্গমস্নানে আনমনে,
বাদ নেই তাতে ফিঙে চড়ুই শ্যামা বেনেবউ
তবে কী অভিমানী চৈতী নিলো বিদায়?

অনুভব

এলো কী গ্রীষ্মাভরণে রাঙা বর্ষ এক নতুন?
পারো কি বলতে কেউ?
চারিদিকে ভাসছে কেনো তবে এতো সুখ সুখ ঢেউ?

হুদুমদেও-এ মাতে নগ্ন পূজারীরা কতো না ধ্যানময়তায়!
খরার বুকে ঝরাবে জল বলে;
মেঘদেবতা তবে নিয়েছে কি পুজো?
তাই কি এমন ঝরছে জল অবেলায় এতো অবিরলে?

ফেরে মন স্বনীড়ে আবার বর্ষ নতুনের মরসুমের কোলাহলে,
অনুভবের অনুবাদে গড়ি তাই সুখের নূপুর
বৈশাখ যে ছুঁয়েছে আমায়,
ছুঁয়েছে মাটি জল ঝরনার বুক
দিয়েছে আরও উছল দুপুর।

পড়েছি তাই আমি আজ চৈতালি কাতান
খোঁপায় গুঁজেছি বকুল
জড়িয়েছি গলায় মেঘমালা হার।
দেখো চেয়ে প্রিয়,
লাগছে কি আমায় হারানো সে প্রিয়ার মতোই তোমার?
তোমায় আজ ফল নয় গো প্রিয়,
ফুল পাখি লতাও নয়
দেবো এক বিরল পহেলা বৈশাখ উপহার। ■

লিভ টুগেদার

অমিতাভ রায়

"শোন রিয়া, তোর বাবা-মা যে বিয়ে না করেই একসঙ্গে থাকে সেটা ঢাকতে হবে। না হলে দাদু রাজি হবে না। তখন প্রবলেম।"

– "এটা আমি পারবো না রণ, পারবো না। তুই বুঝতে পারছিস না, এটা আমার মা-বাবার পক্ষে অপমানজনক।" অসহায়ের মতো রিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে রণপ্রিয়। এই বসন্তের মোলায়েম আবহাওয়াটা কেমন যেন বদলে গিয়েছে। বেশ গুমোট লাগছে। জল তেষ্টা পাচ্ছে রণর।

লেকে বসে গল্প করছিলো ওরা। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। আকাশটা কেমন যেন মেঘলা। বৃষ্টি হয়ে গেলে এই গুমোট অবস্থা কেটে যেতো - ভাবে রণপ্রিয়। আগামীকাল রিয়ার বাবা-মা বিয়ের কথা বলতে আসবে রণপ্রিয়র বাড়ি। তার আগে রণপ্রিয় চায় এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে, যেন রিয়ার বাবা-মা লিভ টুগেদার সম্পর্কে কিছুই না জানায়। কিন্তু রিয়ার কথা শুনে, ও বুঝতে পারে এটা অসম্ভব। এমনিতেই দাদু রক্ষণশীল। এ যুগের কোনো কিছুই দাদুর পছন্দের নয়। আর দাদু বেঁকে বসলে বাবার পক্ষে রাজি হওয়া মুশকিল হবে। চিন্তামগ্ন রণপ্রিয় বাড়ি ফিরে দেখে ঘর অন্ধকার। ইলেকট্রিকের মিস্ত্রিকে ডাকতে হবে। নইলে বাথরুমের জলও পাওয়া যাবে

না। এদিকে মোবাইলের চার্জও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেলো রণপ্রিয়র।

##

বিকেল বিকেল চলে এলো রিয়ার বাবা-মা। তখন থেকেই রণপ্রিয়র বুক ঢিপঢিপ করছে। দাদু বসার ঘরে তখন থেকেই বসে আছে। একেবারেই নড়ছে না। রিয়া দাদুকে প্রণাম করতেই দাদুর মুখ খুশীতে উজ্জ্বল। রিয়াকে পাশেই বসিয়ে রেখেছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না রণপ্রিয়। কখন লিভ টুগেদারের ব্যাপারটা ওঠে কে জানে? ও বাবা-মাকেও এ বিষয়ে কিছুই বলেনি। কিন্তু, দিব্যি কেটে গেলো সময়টা। এ নিয়ে কোনো কথাই হলো না। বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেলো। রিয়ার বাবা- মা আগেই চলে গেলো। রিয়াকে ছেড়ে আসবে রণপ্রিয়। যাওয়ার আগে রিয়া দাদুকে প্রণাম করে বললো, "দাদু একটা কথা বলতে চাই। আমার বাবা বলে, মিথ্যার উপরে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তা ভেঙে পড়বে।" দাদু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে ভাবী নাতবৌয়ের দিকে। রণপ্রিয় ভয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমার বাবা-মা কিন্তু বিয়ে করেনি। রণ এটা আমায় বলতে বারণ করেছিলো।" রণপ্রিয়র প্রচন্ড রাগ হচ্ছে। সোজা বিষয়টাকে অহেতুক জটিল করে দিলো রিয়া। দাদু চুপ করে বসে আছে। ওর বাবা-মাও যে বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তা রণপ্রিয় জানে। জানলার বাইরের কৃষ্ণচূড়া গাছটার উপরে রাস্তার আলো পড়েছে সেদিকেই প্রায় নিঃশ্বাস

বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে রণপ্রিয়। বাইরে একটা কোকিল একঘেঁয়ে সুরে ডেকেই চলেছে। কোনো আওয়াজ না পেয়ে পিছনে ফিরে তাকায় ও। এ কি! দাদু রিয়াকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে!

রণপ্রিয় বুঝতে পারে রিয়া কাঁদছে। "হ্যাঁগো, এই না হলে তোমার উপযুক্ত নাতবৌ।" ঠাম্মার ছবির দিকে তাকিয়ে বলে দাদু। "জানিস মা - তোদের ঠাম্মার বাবা বলেছিলো, এই বেজাতের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো না। তোদের ঠাম্মা, সেযুগে দাঁড়িয়ে বলেছিলো, বাবা, তাহলে তোমার মেয়ে আছে সেটা ভুলে যাও। আমি ওর সঙ্গেই চলে যাবো। আর তুই ঠিক হয়েছিস ওরই মতো।" দাদুর চোখেও জল। "হ্যাঁ রে নাতি, সত্যি কথা বলা শেখ। এই মেয়েটাই তোকে ঠিক করে দেবে। এ যুগে যেটা অন্যায় সেটার বিরুদ্ধেই আমি বলি। তাই তোরা ভাবিস দাদু রাগ করবে।" রণপ্রিয় লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাদু রিয়ার হাত ধরে ওর দিকে এগিয়ে আসে। "দুটো মানুষ ভালবেসে একসঙ্গে থাকলো - যেমন, পশু-পাখি থাকে। মন্ত্র-শাস্ত্র-আচার এসব দিয়ে কি দুজনকে একসঙ্গে ধরে রাখা যায়! ধরে রাখতে পারে শুধু ভালবাসা।" দাদু ওর হাতে রিয়ার হাত ধরিয়ে দেয়। রিয়া তখনো কাঁদছে। রণপ্রিয়র চোখও ঝাপসা হয়ে যায়। বাইরে তখনো কোকিলটা ডেকেই চলেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালগুলো বসন্তের উতলা হাওয়ায় দুলছে। আকাশে কি আজ পূর্ণচন্দ্র? তাইতো মনে হচ্ছে। ■
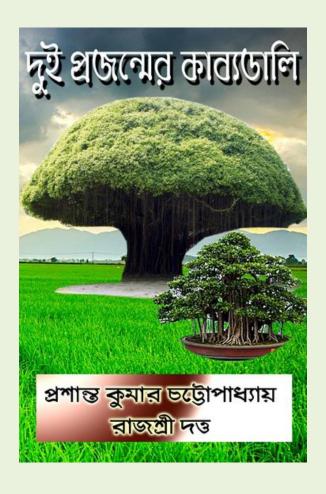
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

মিছিল

অমিতাভ ভট্টাচার্য

এখনো তোকেই খুঁজে চলি
চেনা রাস্তা থেকে অচেনা গলি
কফির পেয়ালা থেকে বেহালা
মানুষের মিছিলে, তোকেই খুঁজে চলি।

উদভ্রান্ত দুপুরে আমি খুঁজে
চলি আগুন আর তুই লাল পলাশ,
খুঁজে চলি ঝিঁঝিঁপোকার কান্না,
অন্ধকারে আলো হাতে ছুটে আসা জোনাকি
মানুষের মিছিলে, তোকেই খুঁজে চলি।

মুখোমুখি লড়াইয়ে তোকে খুঁজে চলি
খুঁজে চলি কলেজের গেট, অচেনা ক্লাসরুমে
বিবর্ণ বসন্তে তোকে খুঁজে চলি,
খুঁজে চলি রঙিন নেশায়, একমুঠো রঙের আশায়...

সময়ে অসময়ে তোকে খুঁজে চলি
খুঁজে আর দু-এক ফোঁটা বিশ্বাসে

অন্বেষণ

আর দু-এক ফোঁটা বিশ্বাসে
হাতে হাত ধরে ছুটে চলা ভালবাসায়...

দিন রাত খুঁজে চলি
খুঁজে চলি কফিহাউসের মান্না
থেকে ভজহরির রান্না,
আর কিছু তুফানী বিকেল...

আলো বাতাস আর আকাশের
টানে তোকে খুঁজে চলি,
মানুষের মিছিলে খুঁজব,
অনন্তকাল ধরে... ■

বেতার ও বৈচিত্র্য*

শামসুদ্দিন শিশির (বাংলাদেশ)

১৩ ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস। বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'বেতার ও বৈচিত্র্য।' প্রতিপাদ্যটি যথাযথ হয়েছে। বেতার বৈচিত্র্যময়তার জন্য মানুষের কাছে যেতে পেরেছে। বেতার মানুষের বন্ধু। আমাদের প্রাণ স্পন্দন। জন্ম থেকেই বেতার মানুষের সুখে দুঃখে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে। এখনো স্বমহিমায় স্থির ও অকৃপণ ভাবে সম্প্রচারিত হচ্ছে বেতারের কার্যক্রম। আমাদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির পথচলা শুরু ১৯৫৪ সালের ২২ জুন। পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬২ সালে। ১ মার্চ ১৯৬৩ সালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আগ্রবাদ কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে ১৯৬৪ সালের ২৭ অক্টোবর। এ. এম. (Amplitude Modulation) প্রতিদিন ১৪ ঘন্টা ৪০ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচার স্থিতি এবং এফ. এম. (Frequency Modulation) প্রতিদিন ২০ ঘন্টা ৪৫ মিনিট বিবিসি, চায়না, রেডিও ইন্টারন্যাশনাল বাংলা অনুষ্ঠান। জাপান রেডিও NHR অনুষ্ঠান প্রচার স্থিতি। বেতার বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণের কাছে তথ্য প্রদান করে থাকে। বিশেষ বুলেটিনের মাধ্যমে

জনপ্রিয় মাধ্যম

জনগণের জন্য সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্প্রচার করে। উল্লেখযোগ্য মাস এবং দিন নিয়ে বিশেষ আলোচনার আয়োজন করে। যেমন, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতার মাস মার্চ। আবার ২১ ফেব্রুয়ারি, ৮ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ০২ এপ্রিল, ০৫ জুন, ১৫ আগস্ট, ২৪ অক্টোবর, ১৬ ডিসেম্বর বিশেষ ভাবে সম্প্রচারিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশেষজ্ঞ, তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার কাজটি বেতার আন্তরিক ভাবে করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে পাঠ, শেখমুজিব আমার পিতা, কারাগারের রোজনামচা বই থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে বইয়ের শব্দগুলো পৌঁছে দেয়। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সোনালী প্রত্যাশা, কৃষি খামার, গাঁয়ের বধুঁ, কথা ও কবিতা, অমর একুশে, সাহিত্য সংস্কৃতি, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জন সচেতনতা সৃষ্টিতে বেতারের অবদান অনস্বীকার্য। ফোনে লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি শ্রোতার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করে বেতারকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এ ছাড়া বছরের প্রথম দিন বই উৎসব নিয়ে আলোচনাও শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকর্ষিত করে।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়েও অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এ ছাড়া ইতিহাস ঐতিহ্য, সভ্যতা সংস্কৃতি তো আছেই। গান নাটক পরিবেশনায় শীর্ষে আছে বেতার। সময়ের আলোচিত বিষয় নিয়ে বেতার আন্তরিকতার সাথে কাজ করে থাকে, যেমন- ডেঙ্গু জ্বর থেকে মুক্তির উপায়, কোরোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি। নিত্য দিনের জদেংভাটা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বন্দরের খবরাখবর, বানিজ্য অর্থনীতির খবর শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে এতটুকু কার্পণ্য করে না।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বেতারই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল। কয়েক গ্রাম মিলে একটি বেতার যন্ত্র হাজারো মানুষের খবরের উৎস ছিল। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের খবর তো আছেই। আলোকপাত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের প্রাণের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকার শিরোনাম, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের খবরাখবর, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ইত্যাদি খবর প্রকাশ করে শ্রোতাদের আপডেট রাখতে বেতারের জুড়ি নেই। প্রায়ই বেতার বহিরাঙণে অনুষ্ঠান ধারণ করে জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

জাতীয়ভাবে উদযাপিত অনুষ্ঠানগুলো সরাসরি প্রচার করার মাধ্যমে বেতার জনগণের খুব কাছে চলে গেছে। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার ধারা বর্ণনা করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গেছে

জনপ্রিয় মাধ্যম

বেতার।। আমাদের দেশের মতো পৃথিবীর সব দেশেই আজ বিশ্ব বেতার দিবস সমান ভাবে পালিত হচ্ছে। পৃথিবীর সব বেতার শ্রোতার জন্য শুভ কামনা। বেতার ও বৈচিত্র্য প্রতিপাদ্যটি বেতারের জন্য প্রযোজ্য। কারণ বেতার জনগণের বিনোদনের জন্য বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ আয়োজনেগুলোকে পরিকল্পিত, সুশৃংখল ও সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন একদল প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল। প্রয়োজন একাধিক সুরম্য রেকর্ডিং কক্ষ, আসবাব পত্র, ইলেট্রোনিক্স যন্ত্রপাতি। বিশ্ব বেতার দিবস সফল হোক। প্রিয় বেতার তোমার জন্য শুভ কামনা রইল। ■

* বাংলা দেশে বেতারের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। অনিবার্য কিছু কারণবশত, এই প্রবন্ধটি ফেব্রুয়ারি ২০২০ সংখ্যাতে প্রকাশ করতে না পারায়, আমরা দুঃখিত।

গুঞ্জনের আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু*

- ■ মে ২০২০ ☞ শ্রমিক দিবস সংখ্য
- ■ জুন ২০২০ ☞ বাদল সংখ্যা
- ■ জুলাই ২০২০ ☞ মৈত্রী সংখ্যা
- ■ অগাস্ট ২০২০ ☞ স্বতন্ত্রতা সংখ্যা
- ■ সেপ্টেম্বর ২০২০ ☞ নৈতিকতা সংখ্যা
- ■ অক্টোবার ২০২০ ☞ শিক্ষণ সংখ্যা
- ■ নভেম্বর ২০২০ ☞ শিশু সংখ্যা
- ■ ডিসেম্বর ২০২০ ☞ মানবাধিকার সংখ্যা

* বিশেষ কারণে সম্পাদক মণ্ডলী নির্ধারিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করতে পারেন।

কর্মফল

পত্রালিকা বিশ্বাস

ফোনটা আসার এক সেকেন্ডের মধ্যেই বটতলা মোড় থেকে ঝড়ের গতিতে বাইক নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেয় সুজয়। বাড়ির সামনে এসে কোনরকমে বাইকটা রেখে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই বিছানার দিকে তাকায়। বিছানায় তখন ওর পাঁচ বছরের ছেলেটা কম্বল গায়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটো লাল, দেখেই মনে হচ্ছে শরীরের তাপমাত্রা এখন বেশিই হবে। ছেলেটার পাশে ধপাস করে বসে পড়ে মাথায় হাত রাখে সুজয়, "কিরে বাবান খুব কষ্ট হচ্ছে? এই তো আমি এসে গেছি সোনা।"

সুজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতেই সীমা বলে ওঠে, "কি গো তুমি এসে গেছো? এক্ষুনি একটা ফোন করো ডাক্তার সেনকে, একবার আসতে বলো। বাবানের জ্বরতো কিছুতেই নামছে না, সঙ্গে এত কাশি..." সুজয় আর দেরি না করে ফোন করে ডাক্তার সেনকে। আধ ঘন্টার মধ্যেই তিনি এসে বাবানকে দেখেন, কিন্তু যা বললেন তাতেতো সুজয় আর সীমা দুজনেরই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। ডাক্তার সেন বললেন, "পেসেন্টকে ইমিডিয়েটলি হসপিটালে অ্যাডমিট করুন, ওর বুকে কফ

জমে আছে, শ্বাসকষ্টও শুরু হয়েছে। দেরি করবেন না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যান।”

হসপিটালে ভর্তি হতেই আই.সি.ইউ.তে নিয়ে যায় বাবানকে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন নিউমোনিয়া, এখন আই.সি.ইউ.তে থাকবে যতক্ষন না শ্বাসকষ্ট এবং ইনফেকশন কমছে।

আই.সি.ইউ.এর বাইরেই সুজয় আর সীমা বসে আছে। সীমা একভাবে কেঁদে যাচ্ছে। সুজয় মাঝে মাঝে আই.সি.ইউ.এর কাঁচের দরজাটায় গিয়ে দেখছে বাবানের মুখের দিকে। মনে মনে বলছে, “বাবানকে ভালো করে দাও ঠাকুর,” হঠাৎ মনে পড়ে যায় – সেদিন ট্রাক ড্রাইভারটা অনেকবার বলেছিল, “স্যার আজকে ছেড়ে দিন, আমার ছেলেটার খুব শরীর খারাপ, টাকার দরকার। আজকে আমার থেকে নেবেন না, আমি পারবো না।” সেদিন ওই ট্রাক ড্রাইভারের একটা কথায়ও পাত্তা দেয়নি সুজয়। কুড়িয়ে কাচিয়ে নিয়ে নিয়েছিল সবটা। এখন আর কাউকে ছাড়তে চায়না ও। অনেকেই বলে, “আমার বউ অসুস্থ সাহেব আমায় ছেড়ে দিন,” কেউ আবার বলে, “সামনে মেয়েটার বিয়ে স্যার একটু কম নিন,” কেউ আবার বলে, “ছেলেটারে স্কুলে দিয়েছি স্যার অনেক খরচ, একটু দেখুন না স্যার।”

আসলে সুজয় এসব কথা এখন শুনতেই পায়না। যতটা যার থেকে পারে ট্যাক্সি, ট্রাক, বাস কাউকেই বাদ দেয় না।

অনুভব

আগে ছিল পেশা, এখন বাঁহাতে এই ভয় দেখিয়ে যার কাছে যতটা আছে কুড়িয়ে নেওয়াটা নেশা হয়ে গেছে ওর। সুজয় ট্র্যাফিক পুলিশ, রোজকার রাস্তায় যাতে ভিড় না হয়, সবাই যাতে সিগন্যাল মেনে চলে, গাড়ি-ঘোড়া যেন নিয়ম মেনে চলে – এই দেখাই ওর কাজ, আর সঙ্গে আছে ওই অদ্ভুত নেশা। এ আর কিছুতেই ছাড়ছে না।

একদিন ওর বন্ধু নবীন ওকে বলেছিল, "ভাই তোর এই বাঁহাতের টাকাই লুটেপুটে খাবে কিন্তু সবাই, কিন্তু এই পাপের ফল তুই একাই ভোগ করবি। কেউ থাকবেনা পাশে। তখন কিন্তু তোর সাথে জেলের ভাত খেতে ছেলে বউ কেউ আসবেনা। মাথায় রাখিস আমার কথাটা।"

সেদিন নবীনের ওপর বড্ড রাগ হচ্ছিল সুজয়ের, কিন্তু এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে – এই যে বাবান আজকে হসপিটালের বেডে শুয়ে এত কষ্ট পাচ্ছে, এও বোধহয় তার নিজেরই কর্মফল।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখ পড়ল সীমার দিকে, বেচারি একটানা কেঁদে যাচ্ছে। ওর সামনে গিয়ে মাথায় হাত রাখল সুজয়। কিচ্ছু হবে না সীমা, দেখো খুব তাড়াতাড়ি আমরা বাবানকে নিয়ে ফিরব। সীমাও হাতটা চেপে ধরে রাখে সুজয়ের। সুজয়ের মনে হচ্ছিল, সত্যি কথাগুলো সীমাকে বলেই ফেলে, বাবানের করুন মুখটা দেখে বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল ওর।

অনুভব

এভাবেই হসপিটালে চারটে দিন কেটে যায় বাবানের। এই কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার এসে বললেন, "পেশেন্টের বাড়ির লোক কে আছেন?" তারপরই সুজয় আর সীমাকে ডেকে বললেন, "আপনাদের ছেলে এখন ভালো আছে। আর দুটো দিন অবজারভেশনে রেখে ছেড়ে দেব ওকে।"

ডাক্তার বলে যাওয়ার পরেও করিডোরে বসে আছে ওরা। সীমার একটু স্বস্তি হলেও, সুজয় যেন কেমন ছটফট করতে থাকে। আসলে বাবানের মুখটা ভেসে উঠছে শুধু... আর ও ভাবছে সেদিন ওই ড্রাইভারের ছেলেটাও এমন ভাবেই... সুজয় আর চেপে রাখতে পারেনা, ওর মনের মধ্যে এখন চেপে বসেছে পাপবোধ। শেষমেষ বলেই ফেলে, "সীমা, এই যে আমি তোমায় দামী শাড়ি, গয়না কিনে দিই, দুই একবার দেশের বাইরে বেড়াতেও গেলাম, বাবানের দামী খেলনা, যদি বলি এসব কোনোটাই আমার মাইনের টাকায় নয়, এই সবকিছু আসে ওই গাড়িগুলো থেকে আসা বাঁহাতের উপরি ইনকামে, তুমি আমায় কি শাস্তি দেবে?"

সীমা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সুজয়ের মুখের দিকে, তারপর বলে, "এ হতেই পারে না সুজয়, আমি তোমায় চিনি।" "তাও যদি হয় এমন কখনো?" সুজয়ের কথা বলতে গিয়ে তখন গলা ধরে আসে।

"এরকম যদি কোনোদিন হয়, আমায় আগেই বলে দিও সুজয়। আর যাই হোক, একটা ঘুষখোরের সাথে আমার

এক ছাদের তলায় থাকার কোনো ইচ্ছা নেই। আর বলে দিলাম ইচ্ছে থাকলেও এসব করতে যেও না। তোমার কর্মের ফল কিন্তু তুমি একাই ভোগ করবে।"

সুজয়ের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। ও ভাবে – "ঠিকই বলেছিল সেদিন নবীন, কেউ নেবে না আমার পাপের ভার, আমায় একাই বইতে হবে। আমার কর্মের ফল, সত্যিই তো, তবে কি এই যে বাবানকে এত কষ্ট পেতে দেখলাম কদিন, সেকি ওই ট্রাক ড্রাইভারের কথা শুনিনি বলে, নাকি এই যে আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে অপরাধের আগুনে, এও কর্মফল..." ■

সনির্বন্ধ অনুরোধ

পাঠক পাঠিকাদের সহযোগিতায় আমরা গুঞ্জনের একাদশ সংখ্যা প্রকাশ করছি। তাই আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কিন্তু শুধু পড়লেইতো চলবেনা, গুঞ্জনেকে আপনার মনের মত করে সাজাতে হলে, আপনার মতামত আমাদের দফতর পর্যন্ত পৌঁছানো একান্ত জরুরি। সুতরাং আপনার মূল্যবান মন্তব্যগুলি লিখে শীঘ্রই আমাদের ই-মেলে পাঠিয়ে দিন।

আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

ঝড় থামার পর

অনির্বাণ বিশ্বাস

(১)
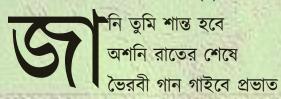
জানি তুমি শান্ত হবে
অশনি রাতের শেষে
ভৈরবী গান গাইবে প্রভাত
নতুন সূর্যালোকে।
মানুষ আবার উঠবে জেগে
নতুন উদ্যমেতে
আবার হাসি হাসবো মোরা
আনন্দে-উল্লাসে।

(২)

কিন্তু...
পুরোনো ঐ চেয়ারটাতে
বসবে কি চেনা কেউ?
চেয়ে থাকবে ফ্রেমবন্দী
ভালোবাসার কেউ?
দিনের শ্রমে ক্লান্ত যে বুকে
মিলতো খুশির ঢেউ
দু'চোখ মোছা বোবা কান্নায় আজ
স্মৃতির শ্মশানের ঢেউ।

পুনরাবৃত্তি

(৩)

যুদ্ধ জয়ের পরে...
পড়ে থাকা আতঙ্ক-হতাশ
অজস্র প্রিয়জন বিয়োগের বুকফাটা
কান্নার ভাষা
বানভাসি হতাশা।

(৪)

যুদ্ধ থামার পরে...
স্তূপাকৃতি বহু বেওয়ারিশ লাশের মাঝে
এবারে পাবেও না খুঁজে
কোনো একান্ত আপন
কোয়ারেন্টাইনে আটকে থাকা এ তুমি
কোন মানব?
হাসছে হ্যাঁ হাসছে
যদি পরকাল বলে কিছু
থেকে থাকে
তবে হাসছে,
ঐ ঐ অ্যামাজনের অবোধ প্রাণীগুলো
যারা পুড়েছিল সপরিবারে অসহায়ভাবে।
প্রগতিকে গতি দিতে জ্বলেনি কি
শহরতলীর বহু বস্তি!
দেখো তাকিয়ে ঐ তারা হাসছে উপর থেকে
হে মানব,

পুনরাবৃত্তি

আজ তুমি কিন্তু বন্দী আপামর
বস্তি থেকে বহুতল।
হোম কোয়ারেন্টাইনে মৃত্যুভয় একটুও কি লাগছে?

(৬)

ভাবো এখন অনেক সময়
এবার একটু তো ভাবো?
সারাদিন চরকিবাজি বাঁদর-নাচন
করতে করতে আমরা ভুলে যাই
মাদারির কথা।

(৭)

তবে,
জানি একদিন দেখা হবে
প্রভাতী সূচনা তুমি জ্বালবে
নতুন আলো
না হলে কিন্তু আগামী প্রজন্ম
করবে না ক্ষমা কোনোদিন।
মহাপ্রলয় আবার উঠবে জেগে
হয়তো ঠিক
একশো বছর পরে! ■

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য কোথায় পাবেনঃ

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://ncdc.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=127&lid=432
https://www.mohfw.gov.in/

নব সূচিকা

সুচিতা সরকার

সে রাতে,
সিংহ দুয়ারখানি খোলাই রয়ে গেছিল।
বিজলী রেখা,
আকাশের ফাটলগুলি আঁকছিল।
বাজ পড়ে,
দূরে কোথাও, সব সবুজ ঝলসে গেছিল।
ঝড়ো হাওয়ায়,
শেষের জানালার কাঁচটাও ভেঙেছিল।
একখানি প্রদীপ শুধু,
ঘরের কোণে সারারাত জ্বলেছিল।

সূর্যোদয়ের আগে দেখা গেছিল,
দু-খানি রক্ত মাখা পায়ের ছাপ,
বাড়ি হতে নির্গত হয়েছিল।

স্বমহিমায় রবি ফিরেছিল, ভোরের আলো মেখে,
প্রভাত ফেরীর নব গানে,
বিহঙ্গের দল, সুরে সুর মেলালো...

আহবান

বিগত রাতের কালিমা মুছে,
নীল আকাশ, সাদা মেঘে গা ভাসাল
রাতের অঝোর বৃষ্টি ধারায়,
পোড়া ফসলও ধুয়ে গেছিল।
কৃষক ভাইরা নতুন আলোয়,
শস্য রোপণে, কোমর বাঁধল।

পুকুর ঘাটে দেখা গেল, একটি ভেজা শরীর,
পুরোনো সব রঙ ধুয়ে
একজোড়া শতদল হাতে নিয়ে,
নূতন হালখাতায়, জীবনী লেখার প্রতীক্ষায়,
নিঃশঙ্ক দাঁড়িয়ে। ■

আমাদের কথা

বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন প্রকাশনার কাজই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তবুও গৃহবন্দী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের মনোরঞ্জনের কথা ভেবে, আমরা 'পাণ্ডুলিপি'র তরফ থেকে সর্বতভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। অনলাইনে ১লা বৈশাখ উদযাপনের জন্যও কিছু কাজ চলছে। শীঘ্রই সে বিষয়ে 'পাণ্ডুলিপি'তে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।

বিনীত
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)
নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কারো পৌষমাস

অসিত চট্টোপাধ্যায়

দেবরাজ সিং আমার প্রতিবেশী। এক অ্যাডভোকেটের গাড়ি চালায়। করোনা ভাইরাসের দাপটে সারা দেশে লক ডাউন চলছে। কোর্ট বন্ধ, চেম্বার বন্ধ, উকিলবাবু বেরোচ্ছেন না। স্ব ইচ্ছায় সতর্ক গৃহবন্দী তিনি। দেবরাজেরও ছুটি। দেবরাজ ভাল ছেলে। দোষের মধ্যে একটু মদ্যপান করে। এই নিয়ে বৌয়ের সঙ্গে নিত্য অশান্তি। করোনা ভাইরাসের অভিশাপ আশীর্বাদ রূপে এসেছে দেবরাজের সংসারে। টিভি, রেডিও সবসময় প্রচার করছে কেউ বাড়ি থেকে বেরোবেন না। হাত বারবার সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। অ্যালকোহল মেশান স্যানিটাইজার এই ভাইরাস প্রতিরোধে খুব কার্যকর।

এদিকে লিকারের দোকান বন্ধ। কিন্তু দেবরাজের হাতযশ আছে। তাকে প্রায়ই উকিল বাবুর পার্টির জন্য লিকার শপে যেতে হয়। কখনো কখনো নিজের জন্যও বটে। ভালো চেনাশোনা হয়ে গেছে। কয়েক বোতল যোগাড় করতে খুব একটা বেগ পেতে হল না। সে বৌকে বলল, “ওষুধের দোকানে হ্যান্ড সানিটাইজার পাওয়া যাচ্ছে না। সাপ্লাই নেই।

তবে তোমার ভয় নেই। আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি।" বৌকে বোঝাল অ্যালকোহল মেশানো স্যানিটাইজার এই ভাইরাস প্রতিরোধে খুব কার্যকর। স্যানিটাইজার যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বাড়িতে তৈরি করে নিলেই তো হয়। এই বলে কয়েকটা বোতল বার করল। দেবরাজ স্নানের বালতি, খাবার জলের জগ সবেতে মিশিয়ে রাখছে স্যানিটাইজার মানে অ্যালকোহল। বৌকে আরো মিষ্টি করে বোঝাল, "জানো ডার্লিং এ জিনিস খেলে করোনা ঘেঁষবেই না।" এই সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গ্লাস ধরিয়ে ছেড়েছে বৌকে। দেবরাজ এখন সানন্দে স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী। গৃহে শান্তিই শান্তি।

দেবরাজ আমাকে ফোন করে জড়ান গলায় জিগ্যেস করল, "আচ্ছা দাদা তাবড় তাবড় নেতা, রাষ্ট্রপ্রধানকে যে গৃহবন্দী করে এটাকে ইংরিজীতে কি বলে?"

আমি বললুম, "হাউজ অ্যারেষ্ট।"

দেবরাজ বললে, "এর থেকে কোয়ারান্টিন নামটা খুব ইজ্জতদার।"

"দাদা আর একটা কথা, আমার ডোমজুড়ের দেশের বাড়িতে একটা গরু আছে। জার্সি গরু। রোজ তিনসের দুধ দেয়। ভাইকে বলেছি গোমূত্র নষ্ট করিসনা। টিভিতে একজন এই ভাইরাস ঠেকাতে গোমূত্রের উপযোগীতা নিয়ে বলছিল। আচ্ছা দাদা গোদুগ্ধের মত গোমূত্র কি ফুটিয়ে খেলে বেশী উপকার?" ■

আমার সোনার বাংলা

রিয়া মিত্র

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বিশাল বড় অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে বেরিয়ে ইউনি- ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন নবীন। নিজেই নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে যান, তাঁর বাড়ি থেকে ইউনিভার্সিটি বেশি দূর নয়। কর্মসূত্রে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর বিদেশে চলে এসেছেন বহু বছর হল, কিন্তু মনেপ্রাণে এখনও তিনি খাঁটি বাঙালি। নিজের বাংলাকে, নিজের মাতৃভূমিকে তিনি এখনও আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালির মতোই, বা বলা যায়, তাদের থেকেও বেশি ভালোবাসেন।

গাড়ি চালাতে চালাতেই মনে পড়ে, আত্মীয় স্বজনের তির্যক মন্তব্য। যখন বহু বছর আগে দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে আসছিলেন, তখন কানে এসেছিল অনেক রকম কথা। পিসিমাই বলেছিল, “নিজের দেশকে, নিজের ভাষাকে যে এত ভালোবাসে, তার কি এই দেশে চাকরি জুটল না – নাকি গোরা সাহেবদের পা চাটার জন্য ঐ দেশভক্তির ভড়ং ছেড়ে বিদেশে ছুটতে হল, বুঝি না, বাপু!”

পুরনো কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই তিনি পৌঁছে গেলেন ইউনিভার্সিটি। গাড়ি থেকে নেমে সোজা হয়ে হাত দুটো

দু'পাশে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, বুকটা গর্বে ভরে উঠছে, চোখে জল টলটল করছে, সামনের কমিউনিটি হলে এখানকার সমস্ত বাঙালিরা এক সুরে তখন গান গাইছে, "চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি....." আজ যে একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

আজ বাবার কথা খুব মনে পড়ছে তাঁর। বাংলা ভাষাকে খুব সমীহ করতেন, খুব শ্রদ্ধা করতেন, খুব ভালোবাসতেন বাবা। বাবার স্বদেশপ্রেমে নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। নিজের জীবনটাও বাবা এই ভাষার জন্যই উৎসর্গ করেছিলেন। বাবার স্বপ্নপূরণ করার জন্যই বিদেশে ইউনিভার্সিটিতে এসেও বাংলা ভাষার ওপরই গবেষণা করে এখানকার ছাত্রদের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বাংলা ভাষার শিক্ষা দেন তিনি। বাবার স্বপ্ন ছিল, বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার। আজ ছেলে হয়ে সেই স্বপ্ন তিনি পূরণ করতে পেরেছেন। বাংলার প্রতি সম্মান জানিয়ে আপনা থেকেই তাঁর মস্তক অবনত হয়ে এলো, কানে ভেসে আসতে লাগল, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি....." ■

বাংরেজী ভাষা

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

যদ্যপি ভাষাচার্য বলিয়া আমার কোন প্রিয় মিত্রই জীবনে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পাইলেননা, তথাপি ইহা ভাবিয়া লইবার কোন কারণ নাই যে ইংরাজ চলিয়া যাইবার পরও ইংরাজী ও বাংলা ভাষার সরল সুবোধ সংযোগ ঘটাইতে তাঁহাদের প্রয়াসে বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল। বোধ করি আমাদিগের কৈশোরকালে, অর্থাৎ সত্তরের দশকে, এই দুই ভাষার মেলবন্ধনের প্রয়াস তুঙ্গে উঠিয়াছিল।

ইংরাজ বিদায় লইল, কিন্তু এদেশে বুনিয়া গেল তাহাদের সম্ভ্রান্ত (!) ভাষাখানির বীজ। সেই বীজসকল হইতে গজাইল কিছু অঙ্কুর, এবং কালে কালে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহীরুহের রূপ ধারণ করিল। বলা বাহুল্য, ইংরাজদের রাজত্বে, তাহাদের নিজ মাতৃভাষা প্রচারের যত না উৎসাহ ছিল, স্বাধীন ভারতে সেই ভাষা প্রচারে ততোধিক উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন বাঙালি করণিক, বড়বাবু এবং ওভারসীয়ারের গোষ্ঠী, যাঁদেরকে সরল সুবোধ বাংলায় বলা হইত 'চাটুকারের দল'।

ইংরাজ দেশ ছাড়িলে, সম্ভবত সর্বাধিক মুশকিলে পড়িয়া ছিলেন এই মধ্যম বর্গীয় 'চাটুকারের দল', কারণ না রহিল রাজার অনুগ্রহ – না মিলিল স্বাধীন ভারতীয়দের বিশেষ আগ্রহ। যাহা হউক, সেই প্রজন্ম তো ক্ষোভ ও অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ লইয়া

কালস্রোতে বিলীন হইল, কিন্তু সমস্যা বাড়িল ইংরাজী আদব কায়দায় অভ্যস্ত এনাদের উত্তরসুরীদিগকে লইয়া। যাঁহারা চিবাইয়া চিবাইয়া সমস্ত রস শুষিয়া লইয়া মুখমণ্ডল হইতে বক্সিম এবং অ-বোধগম্য ইংরাজী শব্দরাশি নির্গত করিয়া স্বাধীন দেশের নাগরিকবৃন্দের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিলেন। অগত্যা, স্বদেশি ও ইংরাজী ভাষার মেলবন্ধনের আশু প্রয়োজন নব্য যুবকেরা অধিকতর রূপে অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙালির বছর ঘুরিতে আঠারো মাস, তাই চিন্তাজগত হইতে কার্যজগতে প্রয়াসটি রূপান্তরিত হইতেই প্রায় আড়াই দশক কাল অতিবাহিত হইল।

যদিও বাঙালিদের ইতিহাসে বিগত সত্তরের দশক (১৯৭০...) একাধিক কারণে স্মরণীয়, তাহার বিস্তারিত চর্চা অদ্য আদৌ উপলক্ষিত নহে, তাই এক্ষণে পাঠককে অধিক বিব্রত না করিয়া মূল প্রসঙ্গে উপনীত হওয়াই শ্রেয়।

পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি আমার বাল্যসাথীদের অনেকেই অফুরন্ত উৎসাহের সহিত স্বেচ্ছায় এই কার্যভারটি বিনা পারিশ্রমিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহাদের সুকঠোর শ্রমদানে এবং অকৃত্রিম প্রয়াসে যে মেলবন্ধনকারী বাংরেজী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কিছু নিদর্শন এবং প্রয়োগভিত্তিক ফলাফলের কাহিনী পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস করিব।

##

জনৈকা নবাগতা সতীর্থা রুমার পিতাশ্রী, মনতোষ বাবু একবার হঠাৎ আমাদের কোচিং-ক্লাসের সব সুশীল কিশোরদের তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ জানাইলেন। গণিত বা

সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান না থাকিলেও, সুন্দরী বান্ধবীর পিতার আহ্বান যে কখনই উপেক্ষা করিতে নাই, সেই বয়সেই আমাদের সেই জ্ঞান টনটনে। অবশ্য আর একটি কানাঘুষা সংবাদও আমাদের নিকট পূর্বেই আসিয়াছিল যে – রুমার অনুজা ঝুমা না কি তাহার চেয়েও অধিক সুন্দরী।

অতএব ক্লাস শেষ হইতেই আমরা তিন সখা বেল্ট ছাড়াই পরা পেন্টুলের ভিতর শার্ট গুঁজিয়া সেই সখীর পশ্চাদে পশ্চাদে তাঁহাদের গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। ওঁদের ভবনে পদার্পণ করিতেই, মনতোষ বাবু আমাদের সাদরে আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, "আমি খুব খুশি যে তোমরা অদ্য আসিয়াছ। নীচে গরম, চল বাবারা উপরে হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিব।" ঝন্টু বলিল, "ও সিওর মেসোমশায়, দেয়ার ইস নো 'চীজ' লাইক কুল ব্রীজ।" মেসোমশায়, মানে মনতোষ বাবু জোরে একটি বিষম খাইলেন, ঝন্টু সম্মুখের টেবিল হইতে উঠাইয়া জলের পাত্রটি তাঁহার হস্তে দিল। সিঁড়িতে আগে উঠিতে উঠিতে মেসোমশায় বলিলেন, "কিঞ্চিত পূর্বে সিঁড়ি মোছা হইয়াছে, বাবারা সাবধানে উঠিও।" মণি ছিল ঠিক তাঁর পিছনে, সে বলিল, "টু অ্যাভয়েড ফল্, 'খুব সাবধানে চল'।" মেসোমশায় পিছন ঘুরিয়া তাহার মুখশ্রী দর্শন করিয়া পরের ধাপে পা রাখিতে গিয়া হোঁচট খাইলেন। মণি পিছন হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

উক্ত ঘটনার পর যথাক্রমে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে ঝন্টু এবং মণি মনতোষ বাবুর দুই জামাতা বনিল, চতুর্দশ বর্ষে আমি ছাড়িলাম দেশ।

##

একদা এক রঙ্গিন অপরাহ্ণে একদল পঞ্চদশী বা ষোড়শী সাঁতরাগাছির সড়ক পরিভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন। রকে রকে সেই বার্তা রটিয়া গেল ক্রমে... অগত্যা আমার কিছু সুহৃদ যুক্তিসঙ্গত ব্যবধান রাখিয়া অতি ব্যস্ততা এবং সতর্কতার সহিত তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। তৎকালীন প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, যখন কিশোরদের দল কিশোরীদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিত, আশেপাশে জনগণের আধিক্য দেখা দিলে যুক্তিসঙ্গত ব্যবধানটি বাড়িয়া যাইত এবং রাস্তা ফাঁকা হইলেই তাহা হ্রাস পাইত। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও সেই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সাঁতরাগাছির মোড় পার হইয়াছে, দুই দলের দূরত্ব এখন শ্রবণ-সীমার মধ্যেই। আমার এক বন্ধু আর একজনকে শুধাইলেন, “হুম শুড ইউ মারবে লাইন?” সুহৃদটির উত্তর আসিবার পূর্বেই, প্রমীলা গোষ্ঠীর কেহ এক কটমটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “ও, কলি’স কেলানে কেষ্টস আর বিহাইন্ড আস!” অগত্যা সুভাষিণীর সূক্তি শুনিয়া, আমার বন্ধুগোষ্ঠী সেই যে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, তাহার পর তাঁহারা আর জীবনে কোন অবিবাহিতা প্রমীলা গোষ্ঠীর ধারে-কাছেও ঘেঁষেন নাই।

##

ফেসবুকে বা হোয়াটস অ্যাপে যখন আজকাল আমাদের সৃষ্ট এই বাংরেজী ভাষাটির প্রয়োগ লক্ষ্য করি, সত্যি বলিতে কি – মুখে প্রকাশ না করিলেও আমি আজকাল বেশ গৌরবই বোধ করি। ■

সবার জন্য পাণ্ডুলিপির উপহার
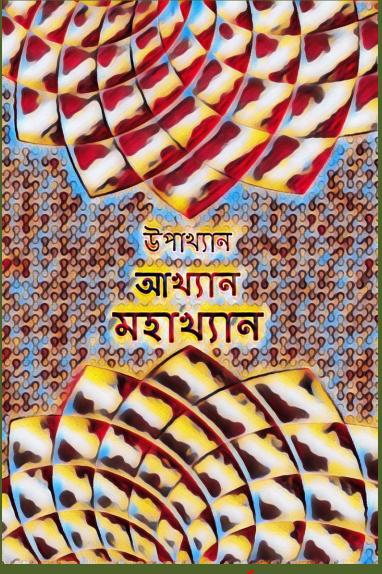
শুভ নববর্ষ

১লা বৈশাখের উৎসবে এবার ঘরের ভিতর থেকেই অংশ গ্রহণ করতে হবে। গুঞ্জনের এই উপহারটি কিন্তু আপনি ঘর থেকেই সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন।